দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ভারতীয় সংবিধানকেই আহত করেছে
—পৃঃ ২৩

ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা দেশের মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলেছে, কর্তব্যপরায়ণ নয়
— পৃঃ ১১

৭৩ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ৯ আগস্ট, ২০২১ ।। ২৩ শ্রাবণ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। পনেরই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

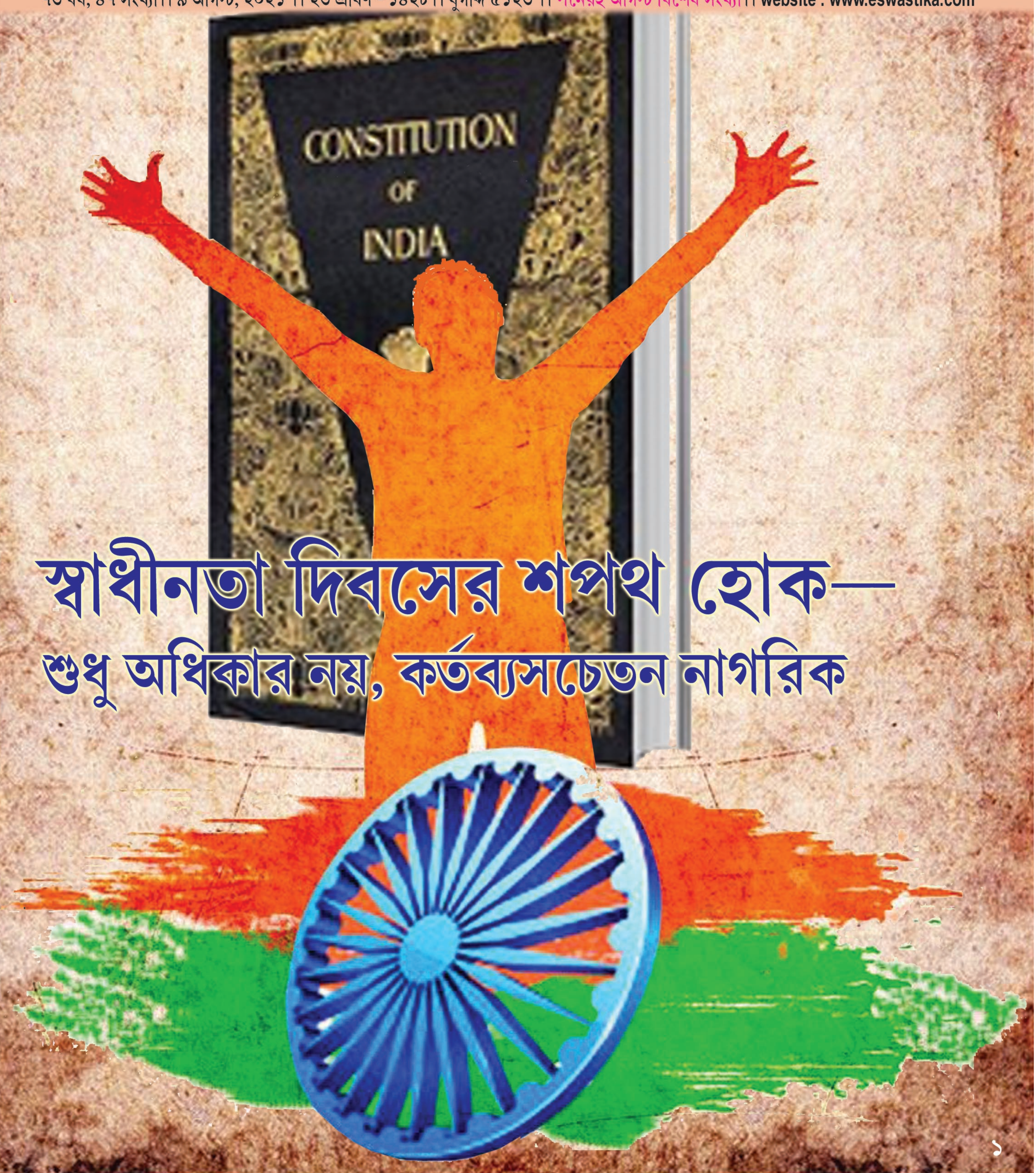

স্বাধীনতা দিবসের শপথ হোক—
শুধু অধিকার নয়, কর্তব্যসচেতন নাগরিক

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।।

৭৩ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৯ আগস্ট - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

প্রসঙ্গ : বিধানসভার উপনির্বাচন ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৬

ত্রিপুরায় এবার তৃণমূল ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কোভিড পরবর্তী ভারতে দরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ◻ রাকেশ কুমার ◻ ৮

দুটি কারণে ত্রিপুরায় গেরুয়া শিবিরে উচ্ছ্বাস ◻ তাপস দত্ত ◻ ১০

ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা দেশের মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলেছে ◻ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ◻ ১১

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ ও জাতিগঠনের প্রতিমূর্তি কে.এম. মুন্সী ◻ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৩

ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের কয়েকটি নমুনামাত্র ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ১৫

দেশের প্রতি কর্তব্যবোধই নাগরিক জীবনের সার্থকতা ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ১৭

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ভারতীয় সংবিধানকেই আহত করে ◻ সুজিত রায় ◻ ২৩

শুধু অধিকার নয়, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধও প্রয়োজন ◻ দীপ্তাস্য যশ ◻ ২৬

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা : ভরতুকিজীবী না বানিয়ে কর্তব্য পরায়ণ নাগরিক চাই ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৮

দশম শ্রেণীর স্কুল পাঠ্যে স্থান পাক বিশ্বজোড়া গণহত্যার ঘটনাগুলি ◻ ড. তরুণ মজুমদার ◻ ৩০

যোগী কবি শ্রী অরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রী : দর্শন ◻ ড. প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী ◻ ৩১

স্বাধীনতার বীর সেনানী ভগৎ সিংহ ◻ ডাঃ আর এন দাস ◻ ৩৩

ব্রহ্মদেশ ভেঙে পাকিস্তান বানাতে জিন্নার কাছে গিয়েছিল রোহিঙ্গারা ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৩৫

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে উড়ছেন মমতা ব্যানার্জি ◻ ড. কুণাল ভট্টাচার্য ◻ ৩৮

বাঙ্গালির বিপর্যয় থেকে উত্তরণ ◻ সৌমদীপ কুণ্ডু ◻ ৪২

শিক্ষাদীক্ষায় ভারতবর্ষ পৃথিবীর পথপ্রদর্শক ছিল ◻ সন্দীপ সেনগুপ্ত ◻ ৪৩

পাদরি স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ৪৫

শাসকদলের অত্যাচারে বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গ ◻ রামানুজ গোস্বামী ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ◻ ভাবনাচিন্তা : ২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

প্রকাশিত হবে
১৬ আগস্ট
২০২১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয়দের ডিএনএ

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত বলেছেন, ভারতীয়দের ডিএনএ একই। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে যারা জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দেন তাদের জিনে শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক সাম্য বর্তমান। শ্রী ভাগবতের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক কিছু কম হয়নি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। লিখবেন— সুজিত রায়, শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিমলশংকর নন্দ, নিখিল চিত্রকর, চন্দ্রচূড় গোস্বামী প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

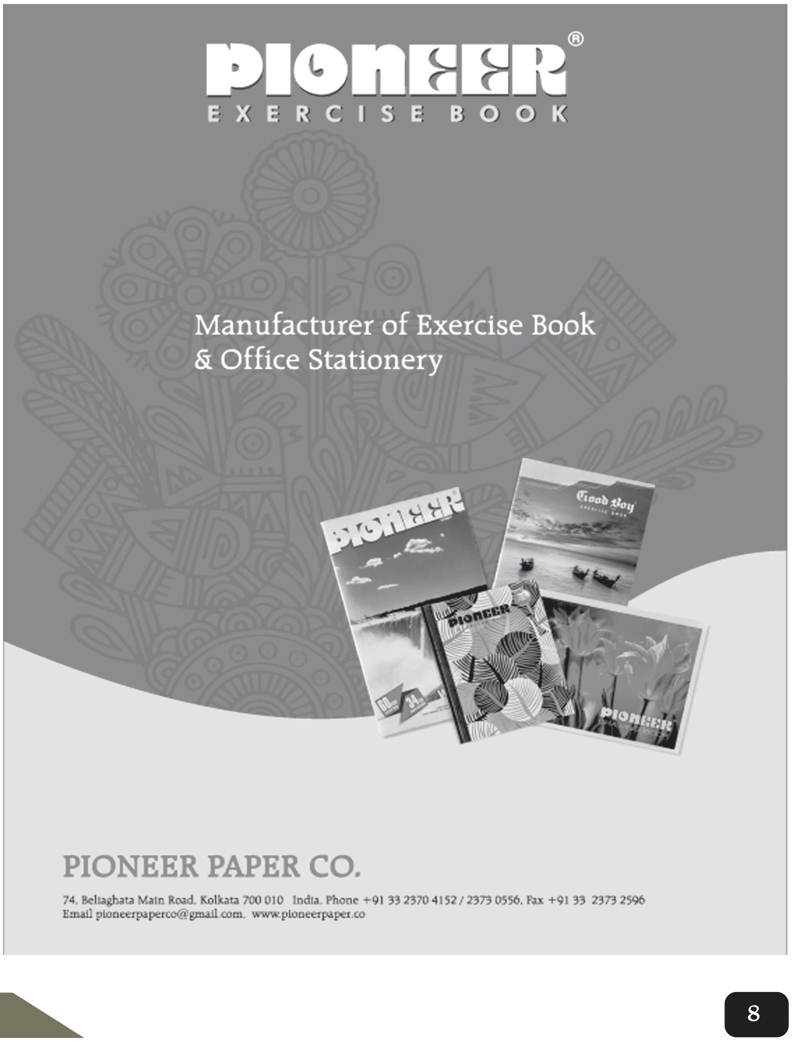

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবসের শপথ

পনেরোই আগস্ট ভারতবাসীর মুক্তির দিন। প্রায় হাজার বৎসরের পরাধীনতার কলঙ্ক হইতে মুক্তির দিন। ইহার জন্য কত শত বীর, বীরাঙ্গনা, বিপ্লবী বুকের রক্ত ঢালিয়াছে। ভারতবর্ষের মাটিতে সোনা ফলিত। তাহার লোভে বিদেশি দস্যুরা এই দেশ আক্রমণ করিয়া ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে। মানুষের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। নারীর সতীত্ব হরণ করিয়াছে। দেশকে পরাধীন করিয়াছে। সেই ঘোর অত্যাচারের দিনগুলিতে ভারতমাতার বীর সন্তানরা লড়াই করিয়াছে। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস সতত সংগ্রামের ইতিহাস। সেই সংগ্রামের পরিণতিতেই দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এই দিন দুঃখও বহন করিয়া আনিয়াছে। ভারতবাসী স্বাধীনতা পাইয়াছে সত্য কিন্তু সেইদিন দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদও ঘটিয়াছে। সত্য কথা হইল, ভারতবাসী খণ্ডিত স্বাধীনতা পাইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, ইহা ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র। প্রকৃত স্বাধীন জাতি পরাধীনতার সমস্ত গ্লানি মুছাইয়া ফেলে। পরাধীনতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পুনরায় পরাধীন হইবার সম্ভাবনা নির্মূল করিয়া ফেলে। পরাধীনতার সময়কালের দাসত্ববোধ, পরমুখাপেক্ষী মনোভাব দূর করিয়া আত্মনির্ভর হইয়া ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে সেইভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস করেন নাই। দাসসুলভ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটান নাই। বরং প্রথম হইতেই তাঁহারা বিশেষ সুবিধা, সংরক্ষণ, জাতপাত, ভেদবিভেদে জাতিকে দীর্ণ করিয়াছেন। ভারতবাসীকে এক জাতি, এক প্রাণ হইতে দেন নাই।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির চুয়াত্তরটি বৎসর অতিবাহিত হইতেছে। জাতি গঠনের পক্ষে এই সময়কাল খুব কম নহে। এই সময়কালেই দেশ তাহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া বিশ্বদরবারে গৌরবের আসন গ্রহণ করিতে পারিত। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার না করিয়া যাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাঁহারা দেশের কথা না ভাবিয়া শুধু নিজেদের কথা ভাবিয়াছেন, নিজেদের পরিবারের কথা ভাবিয়াছেন। দেশবাসীকে সম্পদ না ভাবিয়া ভোটব্যাঙ্ক ভাবিয়াছেন। দেশবাসীকে কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা না দিয়া অধিকার সচেতন করিয়াছেন। দশকের পর দশক ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সংরক্ষণ ও ভরতুকির মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহারই জন্য দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব নষ্ট হইয়া দেশবাসী ভিখারি মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়াছে। দেশের মানুষ দেশের জন্য না ভাবিয়া শুধু নিজের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে। এই কারণেই স্বাধীনতার এতগুলি বৎসর পরেও জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণই বহাল রহিয়াছে। স্বাধীনতা দিবসে দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকেও ইহা ভাবিতে হইবে বই কী! অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইল, স্বাধীনতা বহু দশক পর কেন্দ্রে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ভাবসম্পন্ন দলের সরকার হইয়াছে। তাহারা দেশ ও জাতিগঠনের নানা পন্থা ও প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের নিকট দেশ প্রথম, পরে অন্যকিছু। ইহার ফলে দেশবাসীর মনে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিতেছে। বিশ্ববাসী ভারতকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে শুরু করিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় হইল, এইরূপ একটি দলের সরকারও জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণ বিলোপ করিবার সাহস দেখাইতে পারিতেছে না।

স্বাধীনতা দিবসে শুধুমাত্র আনন্দানুষ্ঠান পালন করিলেই কর্তব্য শেষ হইল না। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা দিবস সংকল্প গ্রহণের দিন। এইদিন স্মরণ করিতে হইবে আমরা কী হারাইয়াছি এবং বর্তমানে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি। ইজরায়েলিদের মতো আমাদেরও শপথ লইতে হইবে আগামী বৎসর স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হইবে অখণ্ড ভারতের বুকে। দেশমাতৃকাকে খণ্ডিত করিয়া আমরা যে পাপ করিয়াছি তাহা মোচন করিতে হইবে। ঋষি অরবিন্দ বলিয়াছেন, দেশ আবার অখণ্ড হইবে। ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। স্বাধীনতা দিবসে মনে-প্রাণে ঋষিবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া তদনুরূপ কার্য করিতে পারিলেই ভারতবাসীর উত্তরণ ঘটিবে।

সুভাষিতম্

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।

দেওয়া, নেওয়া, গুপ্তকথা বলা, জিজ্ঞাসা করা এবং খাওয়া ও খাওয়ানো– এই ছয়টি প্রীতির লক্ষণ।

প্রসঙ্গ : বিধানসভার উপনির্বাচন

রাজ্য বিধানসভায় বেশ কিছু আসনে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। এর মধ্যে দুটি আসনে দলের প্রার্থীর নির্বাচনের আগেই মৃত্যু হওয়ায় সেখানে ভোটগ্রহণ স্থগিত ছিল। দুটি আসনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মৃত্যু হওয়ায় সেই দুটি আসনেও উপনির্বাচন হবে। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর আসনের বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সেই আসনেও উপনির্বাচন হবে। এই ধরনের উপনির্বাচন একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এই উপনির্বাচনকে ঘিরেই এখন রাজ্য-রাজনীতির যত চাপানউতোর, সংবাদমাধ্যমের যত জল্পনা। এর কারণও আছে। কারণ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী পরাজিত প্রার্থীও মন্ত্রিত্ব পেতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব লাভ করার ছ'মাসের মধ্যে তাঁকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে গেলে ছ'মাসের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ৫ নভেম্বরের মধ্যে কোনো কেন্দ্র থেকে জিতে আসতে হবে। ঠিক সেই কারণেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার জন্য তৃণমূলের এতো জোরাজুরি নির্বাচন কমিশনের কাছে। এবং ঠিক এই কারণেই ভবানীপুর বিধানসভা আসনটি রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর দলনেত্রীর জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তার পরিবর্তে তিনি খড়দহ আসনের উপনির্বাচনে দাঁড়াতে মনস্থ করেছেন। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী এই সমগ্র প্রক্রিয়াতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির বাইরেও কিছু শিষ্টতার বিষয় থাকে। সারা রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে জনগণের রায় তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে। তাঁর তো উচিত ছিল মানুষের এই রায়কে মর্যাদা দেওয়া। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার দায় স্বীকার করে নিজে মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে দলের কোনো বিধায়ককে এই পদে বসানো। কিন্তু তিনি তা করেননি। আসলে মমতা ব্যানার্জি সম্বন্ধে একটা কথা রাজ্য-রাজনীতিতে খুব প্রচলন আছে যে, তিনি নিজের দক্ষিণহস্তকেও বিশ্বাস করেন না। আর শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনের আগে থেকেই একটা অভিযোগ করে আসছিলেন যে, তৃণমূল দলটা আসলে পিসি-ভাইপোর অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। এখন কার্যক্ষেত্রে তাঁর এই অভিযোগের সত্যতাই বারে বারে প্রমাণিত হচ্ছে যে মমতা প্রাণেধরেও মুখ্যমন্ত্রী পদটি অন্তত কিছুদিনের জন্য তাঁর কোনো সহকর্মীকে ছাড়তে পারছেন না। একথা অনস্বীকার্য, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, তাই একাধিকবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর এই আন্তরিকতা দেখনদারিতে পরিণত হয়ে যায়। মমতার রাজনৈতিক জীবনে অটলবিহারী বাজপেয়ী ও সেইসঙ্গে জর্জ ফার্নাণ্ডেজেরও অবদান বিশাল। কিন্তু ২০০১ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজের বিরুদ্ধে ওঠা ভিত্তিহীন অভিযোগকে কোনোরকম যাচাই না করে মমতা বিশ্বাসঘাতকতা করে এনডিএ জোট না ছাড়লে, রাজ্যে বিজেপির সঙ্গ না ছাড়লে তাঁকে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আরও একদশক অপেক্ষা করতে হয়তো হতো না। এই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার উদ্দেশ্য একটাই। যে মমতা আগে কথায় কথায় মুড়ি-মুড়কির মতো পদত্যাগ করতে পারতেন, আজ তিনি এতটাই পদলোভী যে পরাজিত হয়েও সেই পরাজয়কে তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

আর এটা পারছেন না বলেই তিনি তাঁর হারের ফল নিয়ে হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও যে তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না, তাও তিনি বিলক্ষণ জানেন। সেই কারণেই দ্রুত উপনির্বাচনের জন্য এতো উতলা হচ্ছেন। তাও সংসদের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা আছে লোকসভায় না জিততে পারলেও রাজ্যসভায় জিতিয়ে এনে মন্ত্রিত্ব অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে, এমনকী সরকারের সর্বোচ্চ নেতৃত্বরূপেও স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

একটা সময়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহই রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। সেই পথও মমতা খোলার চেষ্টা করেছেন। রাজ্যে বহুদিন অবলুপ্ত বিধান পরিষদ পুনরায় গঠনের বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে। কিন্তু তা আপাতত বিশবাঁও জলে, কারণ বিষয়টি সংসদের অনুমোদন-সাপেক্ষ। নির্বাচন কমিশন হয়তো উপনির্বাচন করিয়েই দিতে পারত, কিন্তু বাদ সেধেছে করোনার প্রকোপ। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন যখন আটদফায় এরাজ্যে নির্বাচন করিয়েছিল, তখন আদালতের রায়কে হাতিয়ার করে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য কমিশনকেই দায়ী করে তাকে খুনির আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আজ তারাই নির্বাচনের জন্য এতো উতলা হচ্ছে কেন? রাজ্যে সংক্রমণের হার পড়তির দিকে ঠিকই, কিন্তু সে কার্যত দীর্ঘ লকডাউনের কারণে। গত বছর কেন্দ্র যখন করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে দীর্ঘতম লকডাউনে যেতে বাধ্য হয়েছিল তখন এই বিরোধীরাই প্রধানমন্ত্রীর বাপ-বাপান্ত করে ছেড়েছিল। রাজ্য যেখানে যাত্রী পরিবাহী ট্রেন চালানোর অনুমতি এখনও দিতে পারেননি, করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায়, সেখানে বিধানসভা উপনির্বাচনের কথা বলে তারা কোন মুখে? শুভেন্দু ঠিকই বলেছেন, যে কয়েকবছর যাবৎ রাজ্যে পৌর-নির্বাচন হয়নি, পুরপ্রতিনিধির অভাবে পুর-প্রশাসন যেখানে ধুঁকছে, আগে পৌরনির্বাচন করুক রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তারপর উপনির্বাচনের কথা ভাবা যাবে।

ত্রিপুরায় এবার তৃণমূল

মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

দাদা,

আপনাকে কেউ দাদা বলে ডাকে কিনা জানি না বাঙ্গলার যুবরাজ। আপনি দিদির ভাইপো। সেই হিসেবে গোটা বাঙ্গলার কাছেই আপনি ভাইপো। কারণ, দিদি সবার। দিদির ভাইপো সবার। আপনাকে কাকা হিসেবে নয় দাদা হিসেবেই সম্বোধন করলাম। একই সঙ্গে আগাম অভিনন্দন জানালাম। এই চিঠি যখন আপনাকে লিখছি তখন আপনি ত্রিপুরায়। কলকাতা থেকে অনেক দূরে আগরতলায়। হ্যাঁ, আমি চাই, ত্রিপুরায় আপনার অভিষেক হোক। আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী হোন। বেশি দেরি নেই। ২০২৩ সালে নির্বাচন আছে ওই রাজ্যে। বেশ ভালো হবে। গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারব পাশাপাশি দুই রাজ্যে দিদির সরকার। পিসি-ভাইপো, বাঙ্গলা-ত্রিপুরা।

কিন্তু লড়াইটা দাদা একটুও সহজ নয়। মনে রাখবেন, এই রাজ্যে যেমন ভাবে বামেদের হারিয়ে আপনার পিসি দীর্ঘ কমিউনিস্ট জমানায় ইতি টেনেছেন সেই একই কৃতিত্ব দেখিয়েছে বিজেপি ত্রিপুরায়। না, কোনও বিজেপি নেতার নাম বললাম না। কারণ, বিজেপিতে কোনও ব্যক্তি লড়াই করেন না। লড়ে দল। তবে দাদা, গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলটা আমি একটু আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। হিসেবটা মনে রাখবেন দাদা।

ত্রিপুরার রাজনীতিতে তৃণমূল ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়। গতবার ৬০টি আসনের মধ্যে ১৬টিতে লড়াই করেছিল তৃণমূল। সর্বোচ্চ ভোট যিনি পেয়েছিলেন তাঁর নাম মধুসূদন ত্রিপুরা। তিনি সর্বমোট ৪৩৫টি ভোট পেয়েছিলেন। আর ত্রিপুরায় তৃণমূলের ভোট প্রাপ্তি ছিল ০.৩ শতাংশ। সেবার নোটায় ভোট পড়েছিল ১৬ হাজারের কিছু বেশি। আর তৃণমূল সব আসন মিলিয়ে পেয়েছিল ৬৯৮৯টি ভোট।

যাক, সেসব কথা আপনি বলেছেন, 'আমাকে বার বার আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আটকানো যায়নি। আমরা লোহার মতো। যত তাতাবে, তত শক্ত হবে। আমাদের যত তাতাবে, তত জেদ বাড়বে।' তার পরেই বিজেপির উদ্দেশে অভিষেক আপনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, 'আজকের তারিখ লিখে রাখুন। তৃণমূল একবার ত্রিপুরায় পা রেখেছে। ত্রিপুরাই এখন আমাদের পাখির চোখ। আগামী দেড় বছরে এখানে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সরকার গড়ব। তবে তাতে আপনাদের সহযোগিতা দরকার।' ক্ষমতায় আসার পরে ত্রিপুরার মানুষও দুয়ারে সরকার ও অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

বাহ্। আপনাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে। দাদা, একটা কথা বলি, ত্রিপুরায় সরকারি কর্মচারিরা কিন্তু কেন্দ্রের হারে সপ্তম বেতন কমিশনের নিয়ম মেনে বেতন পান। সেখানে আবার বাঙ্গলার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবেন নাকি! তার চেয়ে বরং পিসির সঙ্গে কথা বলে আগে ত্রিপুরার নকল করে বাঙ্গলায় সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা যায় কিনা দেখুন।

ত্রিপুরায় যাওয়ার পর থেকে কীভাবে বার বার আপনাকে আটকানোর চেষ্টা হয়েছে সেই বিবরণও সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন আপনি। টিভিতে দেখলাম আপনি বলছেন, দলীয় কর্মীদের দিয়ে আপনার গাড়িতে হামলা চালানো থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে আপনাকে থামানোর চেষ্টা করলেও বিজেপি ব্যর্থ হয়েছে।

এই জায়গাটায় আমি একটা কথা বলি। বিজেপি যা করেছে তা একেবারে অনুচিত। এটা বিজেপি কেন, কোনও দলের সংস্কৃতি হতে পারে না। সুস্থ গণতন্ত্রে বিরোধীদের আটকানোটা অনভিপ্রেত। কিন্তু দাদা, আমি খালি আপনাকে মনে করাতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে আপনারাও কি ঠিক করেছেন? প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের হেলিকপ্টার নামার সুবিধাটুকু দেন না। আর বাঙ্গলায় বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের গাড়িতে কমপক্ষে এক ডজনবার ভাঙচুর হয়েছে। শীতলখুচিতে দিলীপ ঘোষকে রক্তাক্ত করা হয়েছে।

না, এসব মনে রাখতে হবে না। আপনাকে একটা তারিখ মনে করাই। ১০ ডিসেম্বর, ২০২০। আপনার নিজের লোকসভা এলাকা ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। মনে পড়ছে অভিষেকদা, কী হয়েছিল সেদিন। নাড্ডার গাড়িতে হামলা, কনভয়ের একের পর এক গাড়ি ভাঙা হয়েছিল। মনে রাখুন, ওই দিন আপনার প্রিয় মুকুল রায় দাদার আঙুলে এমন চোট লেগেছিল যে যন্ত্র দিয়ে হাতের আঙটি কাটাতে হয়েছিল। আমি আশা করি ত্রিপুরায় আপনার উপরে অনভিপ্রেত গো-ব্যাক স্লোগান ওঠার সময়ে একবার হলেও আপনার মনে সেই স্মৃতি ভেসে উঠেছিল।

ভালো থাকবেন, ত্রিপুরার আগামী মুখ্যমন্ত্রী।

ভ্রম সংশোধন

স্বস্তিকার গত ২ আগস্ট সংখ্যায় ১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'আল আমিন কেন স্কুল খোলে না' শীর্ষক প্রতিবেদনের লেখক হিসেবে ভুলবশত সোমেশ্বর বড়ালের নাম মুদ্রিত হয়েছে। এটি অন্য একজন প্রতিবেদক লিখেছেন।

— স্বঃ সঃ

অতিথি কলম

রাকেশ কুমার

কোভিড পরবর্তী ভারতে দরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা

দুর্বল ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন ও তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার দিয়ে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা আগামী ৪-৫ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

কোভিড জনিত পরিস্থিতি অর্থনীতিকে ধ্বস্ত করে বহু জীবিকা কেড়ে নিয়েছে। ভবিষ্যতের নাগরিকরা যাতে সময়োপযোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় সেদিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে।

আজকে যখন কোভিড-১৯ বিদায় নিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তখনই এর ফেলে যাওয়া চিরস্থায়ী দাগগুলি এক জীবনের স্মৃতির মধ্যে আরও প্রকট হয়ে উঠছে। ৪ লক্ষের বেশি নাগরিকের জীবন কেড়ে নিয়েছে এই মারণব্যাধি। এদের মধ্যে অজস্র মানুষ ছিলেন পরিবারের মধ্যে একমাত্র রোজগেরে। কেননা অধিকাংশ মৃত্যুই ঘটেছে ৫০ বছরের কম বয়সিদের। ফলে এদের সন্তানসন্ততিদের অনেকের ভবিষ্যৎই হয়ে পড়েছে চূড়ান্ত অনিশ্চিত। দ্বিতীয় ঢেউয়ের পরের প্রচুর মৃত্যুও আমাদের বিবেককে দীর্ঘদিন দংশন করবে। এই মহামারী দেশ জুড়ে দ্বৈত সমস্যার সৃষ্টি করেছে— একদিকে স্বাস্থ্য, একদিকে অর্থনীতি। একটি খসড়া হিসেব অনুযায়ী ২৩ কোটি ভারতীয় ২০২০ সালেই দারিদ্র-সীমার নীচে নেমে গেছে। এর ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে স্বাস্থ্যব্যবস্থার অপ্রতুলতাও নগ্নভাবে চোখে পড়েছে বিশেষ করে শহরতলি অঞ্চলে। প্রাণ বাঁচাতে আজীবনের সঞ্চয় খরচ করে ফেলার ফলে পরবর্তী সময়ে জীবিকার সংকট একেবারে জীবন সংকটে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে দেশের হাসপাতালগুলিতে রোগীর অপ্রত্যাশিত চাপ গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটিকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

আজকে যখন দেশ একটু একটু করে সুস্থতার দিকে চলেছে তখন কিন্তু ভাবার সময় এসেছে ভবিষ্যতে এমন মহামারীর প্রার্দুভাব হলে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে? কীভাবে প্রস্তুত রাখব নিজেদের? একটি সহজ উত্তর স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে দেশের বিনিয়োগ বাড়িয়ে তোলা যাতে সকলেই স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষ করে প্রাথমিক পরিষেবার আওতায় আসতে পারে ইউনির্ভারশেল হেলথ কভারেজের (ইউএইচসি) মাধ্যমে। অবশ্যই এই সাজেশানটি নতুন বোতলে পুরনো মদ সন্দেহ নেই। পরাধীন ভারতে এই প্রস্তাব প্রথম দেন Josef Bhore Committee। এর পর সরকার দ্বারা আরও বহু কমিটি গঠিত হয়েছে। WHO-এর health for all ৪০ বছর আগে দেওয়া স্লোগান আর সাম্প্রতিক ২০১৮ সালে আস্তানায় (কাজাকস্তানে অবস্থিত) আবার নতুন করে একে জিইয়ে তোলা হয়েছে। তবে যতই পুরনো ভাবনা হোক আজ কিন্তু এর অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের সময় এসেছে। একথা অনস্বীকার্য জনস্বাস্থ্য রক্ষার দীর্ঘস্থায়ী পন্থা হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাই সর্বাপেক্ষা ফলদায়ী। এটি সমগ্র জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্তকারী একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনগুলি মেটাতে এর কার্যকারিতা বিরাট। এর ওপর গুরুত্ব বাড়ালেই রোগ হওয়ার আগেই জনগণ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করবে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে যতটুকু স্বাস্থ্য পরিকাঠামো রয়েছে তার ওপরও অনাবশ্যক চাপ পড়বে না। হু-এর অধীনে (ঠিকভাবে চালু হলে) নাগরিকরা পূর্ণাঙ্গ, প্রতিষেধক সমৃদ্ধ (করোনা টিকা নয়), অসুস্থতার পর সেরে ওঠা অবধি ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক চাপ ছাড়াই সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে। এখানে বিভিন্ন মহামারী সংক্রান্ত ব্যাধির প্রতিষেধকের আগাম প্রয়োগ খুবই গুরুত্বের।

হু-এর সূচিত সর্বজীবন স্বাস্থ্য পরিষেবা অন্তর্ভুক্তি (ভিএইচসি) যা বিস্তারিতভাবে হু-এর ২০০৭ সালে জারি করা বৃহত্তর ধাঁচার মধ্যে ধরা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় 'building blook'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেবা প্রদান, নির্দিষ্ট প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সেনানী নির্মাণ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর জনসাধারণের আয়ত্তাধীন করা, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সহজে উপলব্ধ হওয়ার সুযোগ আর এগুলিকে বাস্তবায়িত করতে গেলে দরকার স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচ বাড়ানো ও কঠিন প্রশাসনিক নজরদারি।

এই building blook পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে তিনটি নীতিগত প্রশ্ন উঠে আসবে। (১) কে এই পরিষেবার অধিকারী হবে, (২) কী কী ধরনের পরিষেবা দেওয়া হবে, (৩) কত দূর অবধি খরচ সরকার বহন করবে? এই সূত্রে ভারত অন্যান্য কিছু ছোটো দেশের কাছ থেকে অনুসরণযোগ্য কিছু পদ্ধতি নিতে পারে। তা করতে পারলে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাল রেখেই মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধকে এক সুযোগে রূপান্তরিত করতে পারে। ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া বা থাইল্যান্ডের মতো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলি পরিষ্কার করে দেখিয়েছে

স্থ প্রকল্পে শুরুর দিকে বিনিয়োগ করলে অনায়াসে আগে থেকেই মহামারীর বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকা যায়। রসদের অভাব হয় না কেননা তৃণমূল স্তরে আক্রান্তের প্রবণতাটাই কমিয়ে দেওয়া যায়।

কোভিড-১৯ আছড়ে পড়ার আগে ভারত কিন্তু স্থ-প্রকল্পের সফলতার দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মহামারী এই প্রচেষ্টাকে অনেকটাই ব্যাহত করেছে। বিশেষ করে সরকারের অর্থাভাব যার সঙ্গে জড়িত আছে পর্যাপ্ত চিকিৎসা বলের অভাব। ২০১৭ সালের স্বাস্থ্যনীতিতে কিন্তু সফল হবার পথ নির্দেশ রয়েছে। এতে স্বাস্থ্য বাজেটকে জেডিপি-র ১.১৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে বৃদ্ধির প্রস্তাব ছিল। এই বৃদ্ধি পূর্ণ কার্যকর হতে ২০২৫ সালকে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। একইসঙ্গে আকাশছোঁয়া স্বাস্থ্য খরচের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এমন পরিবারের সংখ্যা ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনার ওপরও গুরুত্ব ছিল। আরও সম্প্রতি ১৫তম অর্থ কমিশন একই ভাবে ২০২২-এর মধ্যে আরও বাড়াতে বলেছে। যদিও এর কোনওটাই দিনের আলো দেখেনি। বাস্তবে প্রত্যেক রাজ্যকে বর্তমানের থেকে তাদের সামগ্রিক বাজেটের ৮ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটালে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই সূত্রে কতকগুলি কঠিন ব্যবস্থা সম্প্রতি নিয়েছে। আগের থেকে স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৩৮ শতাংশ খরচ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে টাকার অঙ্কে ৬৪১৮০ কোটি টাকা শুধু 'আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত যোজনার' ক্ষেত্রেই বরাদ্দ করা হয়েছে যা আগামী ৬ বছর ধরে প্রাথমিক, তার পরের স্তর ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্য আনুষাঙ্গিক স্তরে খরচ করা হবে। এক্ষেত্রে ৭৫৫০০ টি আরোগ্য কেন্দ্রে 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প' দীর্ঘস্থায়ী ও সফল একটি প্রকল্প হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা স্তরে কাজ করছে। কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে রোগ পরীক্ষা ও তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যোগ্য গ্রাহকদের আয়ুষ্মান ভারত সঠিক অর্থকরী পরিষেবা দিয়েছে। প্রশংসাযোগ্য ভাবে দেশ বিনামূল্যে সরকারি হাসপাতাল ও অনুমোদিত কেন্দ্রে বিপুল টিকাকরণ করে চলেছে। আয়ুষ্মান ভারতকে ওপিডি অর্থাৎ হাসপাতালের বহির্বিভাগের ক্ষেত্রেও পূর্ণ প্রসারিত করতে পারলে আরও বড়ো সফলতা আসবে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে হবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভারতে ইউএইচসি-কে সফল করতে সরকারি খরচ ভরকেন্দ্র হলেও বেসরকারি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তেমন হয়নি। ইউএইচসি-র সাফল্যের ক্ষেত্রে এই বেসরকারি ক্ষেত্র যারা ৭০ শথাংশ ভারতীয়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয় তাদের যোগদান অপিরহার্য। সরকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রের পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ দূর করে যৌথভাবে ইউএইচসি-কে সফল করতে হবে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের উল্লেখিত দেশগুলি এই কাজে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সেখানকার নাগরিকরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেতে শুরু করেছে। কেন্দ্রের দরকার বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্ব কিছুটা হলেও বণ্টন করে দেওয়া।

দুর্বল ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন ও তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার দিয়ে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা আগামী ৪-৫ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরাও বাদ যাবেন না। জনসংখ্যার গড় বয়সের নিরিখে ভারতের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর তাদের তারুণ্যের কর্মদক্ষতাকে যথাযথ ব্যবহার করে ব্যাপক উন্নতি করেছে। ভারতকেও তাদের তরুণ শক্তির অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সাফল্যের গল্প তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও যুব কল্যাণ দপ্তরকে মিলিতভাবে কাজ করে যাতে যুবক যুবতীরা সুস্বাস্থ্য, সঠিক শিক্ষা ও শিক্ষান্তে ভদ্র কর্ম নিযুক্তির সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। পরিশেষে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় আগে বলা স্বাস্থ্য পরিষেবা কারা পাবে, কী ধরনের পাবে আর অর্থের প্রয়োজন কতটা হবে এগুলির সফল নির্ধারণে তীব্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। এটি জনগণের বিষয় বিশেষ করে গ্রাম ও শহরতলীর যেখানে কোভিডের আক্রমণ ও সেবার অভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। ভবিষ্যতে এ থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে ইউএইচসি (সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিযোজনা) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হওয়া উচিত।

(লেখক পূর্বতন যুগ্ম সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ)

শোক সংবাদ

দক্ষিণদিনাজপুর জেলার দাড়ালহাটের স্বয়ংসেবক অধুনা বালুরঘাট নিবাসী সুব্রত দাস গত ৩০ জুলাই পরলোকগন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও ২ নাতি রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র সুবীর দাস বালুরঘাট নগরের স্বয়ংসেবক।

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক মানস গোস্বামীর মা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামীর বউদি মোক্ষদা গোস্বামী গত ২৯ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ১ পুত্র ,২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

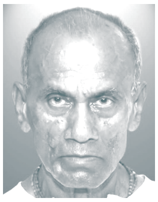

পুরাতন মালদা নগরের মঙ্গলবাড়ি শাখার স্বয়ংসেবক বাসুদেব ঘোষের বাবা নিতাইচন্দ্র ঘোষ গত ২৫ জুলাই পরলোকগমন করেন। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

উত্তরবঙ্গ সীমান্ত চেতনা মঞ্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রচারক গণেশ পালের পিতৃদেব বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্তোষ পাল গত ২৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

দুটি কারণে ত্রিপুরায় গেরুয়া শিবিরে উচ্ছ্বাস

তাপস দত্ত

কোভিড-১৯ আবহে ত্রিপুরায় শাসক দল জুলাই ২০২১-এ দুটি রাজনৈতিক কারণে উজ্জীবিত। প্রথমত, পশ্চিম আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্তি, দ্বিতীয়ত, দলের জাতীয় সভাপতি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের যুগ্ম সম্পাদক কিশোর বর্মণকে ত্রিপুরায় সংগঠন সুদৃঢ় করতে দায়িত্ব প্রদান। প্রতিমাদি ও কিশোরের বাড়ি ত্রিপুরার সোনামুড়া মহকুমায় যথাক্রমে বড়নারায়ণ ও কেমতলি গ্রামে। দুজনেই সাধারণ পরিবারের মানুষ। তাদের পরিবারে অন্য কেউ রাজনীতিতে অংশ নেয়নি কখনো।

প্রতিমা ভৌমিক ও কিশোর বর্মণ উভয়েই অকৃতদার। প্রতিমাদি রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ১৯৯১-এ গেরুয়া শিবিরে তার রাজনীতি শুরু। সাধারণ কর্মী থেকে ক্রমশ উন্নীত হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে। ১৯৪৯-এর ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতে যোগ দেওয়ার ৭২ বছর পরে রাজ্যের কেউ এই প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতি অনুযায়ী। বিজ্ঞানে স্নাতক প্রতিমাদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গের ড. ত্রিগুণা সেন ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে মন্ত্রিত্ব পান।

অসমের সন্তোষমোহন দেব ১৯৯১-এ লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার পশ্চিম আসনের সাংসদ হয়েই পিভি নরসিমহা রাওর মন্ত্রীসভায় ইস্পাতমন্ত্রী হন। ত্রিপুরার উন্নয়নে একটিও কর্তব্য পালন করেননি ওই দুজন মন্ত্রী। এই দৃষ্টি অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার প্রথম পুনর্বিন্যাসে প্রতিমা ভৌমিকের অন্তর্ভুক্তি ত্রিপুরাবাসীর কাছে অকল্পনীয় ও আশাতীত প্রাপ্তি।

মুসলিম লিগের দেশভাগের দাবির প্রবল সমর্থক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কংগ্রেসের সম্মতিতে ত্বরান্বিত হয় দেশভাগ। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা প্রাণ ও মান বাঁচাতে স্রোতের মতো আসতে থাকে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায়। কুমিল্লা থেকে আসা এমনই দুটি পরিবারের সন্তান প্রতিমা ও কিশোর গভর্নমেন্ট কলেজ বিলোনীয়ায় বাংলা অর্নাস পড়ছিলেন। এসএফআই জানতে পারে কিশোর এবিভিপি সমর্থক। সিপিআই (এম)-এর ছাত্র সংগঠনটি ফতোয়া দেয় তাদের মেম্বারশিপ নিতে। কিশোর জানায় এবিভিপি অরাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন। কিশোরকে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়েছিল এসএফআই। আহত কিশোর বাড়িতে চলে যান।

পরে এবিভিপি-র ড. আর কে ঠাকুরের উদ্যোগে কিশোর আগরতলায় পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর স্নাতকোত্তর ২০০৬-এর কিশোর এবিভিপি-র দায়িত্ব পেয়ে কলকাতা যান। সঙ্ঘের প্রচারকও হন। এবিভিপি-র রাষ্ট্রীয় সম্পাদকও হন কিশোর। ২০১৮-র জুলাইয়ে পদ্ম শিবিরের ছাতায় সভাপতি অমিত শাহ কিশোরকে পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। পরে যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক হন। এখন ত্রিপুরায় সাধারণ সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্বে এসেছেন কিশোর। যারা তাকে নির্যাতন করেছিল, তাদের পরিবারও কিশোরের সাহায্য নিয়েছে।

ত্রিপুরা এবিভিপি-র সংগঠন সম্পাদক রূপম দত্ত বলেছেন, সঙ্ঘ ও বিবিধ ক্ষেত্রের আদর্শ কার্যকর্তার প্রতীক হলেন কিশোর বর্মণ।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সঙ্গে কিশোর বর্মণ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রতিমা ভৌমিক।

ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা দেশের মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলেছে, কর্তব্যপরায়ণ নয়

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, এখন তার পঁচাত্তরতম জন্মদিন পূর্ণ হতে চলেছে। প্রথম পঁচিশ বছর কেটেছে শৈশবে, দেহের পূর্ণতা পেতে এবং তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতিকল্পে। পরের পঁচিশ বছর কাটলো বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টায়। শেষ পঁচিশ বছর পূর্ণতা প্রাপ্ত দেশ উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল। দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের পরের পঁচিশ বছরের কর্মসূচি হোক 'নাগরিকের কর্তব্যবোধ'। আমরা অর্থাৎ ভারতের জনগণ স্বাধীনতার আগে থেকেই এক অদ্ভুত আত্মঘাতী রাজনীতির শিকার। কেমন করে? যেমন ধরা যাক, বড়ো নেতার কাউকে অপছন্দ। তাই বড়ো নেতা ও তার দলবল (বলা ভালো, স্তাবককুল) অপছন্দের নেতাকে সরাতে দরকারে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতেও পিছপা হয় না। এই ঔদ্ধত্ব ও স্তাবকতা ভারতীয়দের মজ্জাগত। ইতিহাসে তার ভুরিভুরি প্রমাণ আছে। এখানে নির্দিষ্ট পরিসরে সেসব আলোচনার জায়গা নেই। তবে এটা না বললেই নয় যে এর ফলে আমাদের দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এই জায়গাতেই মানসিকতার বদল দরকার। কারণ, দেশের উন্নতির প্রথম সোপান হলো সমাজের উন্নতি। সমাজের উন্নতি তখনই সম্ভব যখন আমাদের কর্তব্যবোধ ও সচেতনতা আসবে।

স্বাধীনোত্তর যুগে সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা হয়েছে— যে সরকার (অবশ্যই দলীয়) যত বেশি অনুদান দেবে সেই সরকারই তত ভালো কাজ করছে! এটি কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী। সরকার যখন এ ধরনের অনুদান বাড়াবে, তখন তার অর্থভাণ্ডারের উপর অনুৎপাদক খরচের বোঝা বৃদ্ধি পাবে। এই অতিরিক্ত অর্থের জোগানের জন্য সরকার সাধারণ মানুষের উপর বিভিন্ন খাতে করের বোঝা বাড়াবে। এর ফলে দেশের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা— সবই বাধা পাবে। তথাকথিত ওয়েলফেয়ার অর্থনীতির থিয়োরি আউড়ে কিছু নোবেল প্রাইজ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে সেই ওয়েলফেয়ার অর্থনীতি মেনে চলা সরকারগুলি যে তাদের দেশের দারিদ্র ঘোঁচাতে পেরেছে, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে কমিউনিস্টরা সর্বদা এই অনুদান প্রথাকে সমর্থন করে। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, এতে দরিদ্র জনসাধরণের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদের সরকারি টাকায় অনুদানের মাধ্যমে দলীয় নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র জনগণের পক্ষে সরকারি ও দলীয় অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু কোনো দেশেই এই পদ্ধতিতে দেশের ও সমাজের উন্নতি করা সম্ভব হয়নি।

> **কোনো রাজনীতিক, কোনো তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বলছেন না যে, আমরা ভারতীয়রা যদি ভারতীয়ত্ব জলাঞ্জলি দিই, তাহলে ভারতের অস্তিত্বই থাকবে না— সেক্ষেত্রে আমাদের কারোরই অস্তিত্ব থাকবে না।**

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও আমাদের দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে সামাজিক বৈষম্যের শিকার। সমাজে একদল মানুষ শুধুমাত্র জন্মের ভিত্তিতে বা ধর্মের ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধা পাবে আর অন্যান্যরা বঞ্চিত থাকবে— এতে শুধু যে সামাজিক সাম্য ব্যাহত হচ্ছে তাই নয়, সামাজিক উত্তেজনা ও হিংসার ঘটনা ঘটছে। এতে দেশাত্ববোধের মূলেও কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। এর জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল কর্ণধারদেরই শুধু নয়, দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে। সমাজের সকল স্তরে সার্বিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ না থাকলে একটি জাতি শুধুমাত্র স্বাধীন দেশের পতাকাসম্বল করে বিশ্বের দরবারে কোনো ছাপ ফেলতে পারে না। সবচেয়ে আগে যে বোধটা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন তা হলো দেশাত্মবোধ। আমাদের ভারতীয়দের মধ্যেই দেশাত্মবোধের ধারণায় ফারাক আছে। এই অবস্থার জন্য বর্তমান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষই দায়ী। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধী দলনেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী। ইন্দিরাজী একদিন সন্ধ্যায় অটলজীকে জরুরি তলব করলেন। তারপর অটলজী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন। অটলবিহারী বেরিয়ে যাবার পর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হলো, রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর প্রশ্নে তোলা বিভিন্ন অভিযোগের জবাবে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করবেন বিরোধী দলনেতা শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ইন্দিরা গান্ধী ও অটলবিহারীর

ফঃ ২

রাজনৈতিক দর্শনের ফারাক বিস্তর। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী জানতেন যে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ও অন্যান্যদের মুখের উপর জবাব দেওয়ার যোগ্যতম ব্যাক্তি হলেন অটলবিহারী। অটলবিহারীও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যতই রাজনৈতিক দূরত্ব থাকুক, দেশের স্বার্থে তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে তাঁরা একমাত্র দেশের স্বার্থকেই প্রধান্য দিয়েছিলেন। আর এখন! পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীর উপর জঙ্গি হামলার ঘটনাকে অস্বীকার ও বিকৃত করার চেষ্টায় বেশ কিছু বিরোধী নেতৃত্বের ভূমিকা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখন রাজনীতি সর্বদা বিরোধিতায় শুরু ও বিরোধিতায় শেষ হয়। একমাত্র কমিউনিস্ট দলগুলিই যে কোনো ভারত বিরোধী কাজে উল্লসিত হয় বা নীরব থেকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা ভারত সরকারের সঙ্গে নেই।

১৯৬২ সালের চীনা আগ্রাসনের সময় থেকে সাম্প্রতিক জঙ্গি হানা, এমনকী লাদাখে প্যাংগং লেকের ঘটনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিন্দায় তারা ব্যাপৃত ছিল। এই ট্রেন্ড এখন বিরোধী নেতাদের মধ্যে বহুলাংশে দেখা যাচ্ছে। আসলে রাজনীতি এখন পেশা হওয়ায় ও তার জন্য কোনো যোগ্যতামান না থাকায় নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকদের মধ্যে শুধু যে প্রগলভ বা রুচিহীন কথাবার্তার চল হয়েছে তাই নয়, সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে কখন যেন দেশের বিরোধিতা করা হচ্ছে। রাজনীতির মান বাড়ানোর জন্য দেশের স্বার্থে এদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের শিক্ষার আশু প্রয়োজন। আবার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অথবা রাজনীতিগত লাভ-ক্ষতির বিচারে সমাজের তথা দেশের প্রতি কর্তব্যবোধও জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত লাভ ও সুযোগসুবিধা বৃহত্তর সমাজের লাভের চেয়ে আজ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সমাজের মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে, জাতপাতের ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধাভোগের প্রত্যাশী।

আমাদের দেশে, জাতপাতের ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে বিশেষ সুবিদাভোগের প্রত্যাশী। জাতপাতের ভিত্তিতে শিক্ষা ও চাকরির সংরক্ষণের পঁচাত্তর বছর পরেও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষজন সমাজের বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টার পরিবর্তে এই বিশেষ সুবিধা প্রয়োজন ব্যতিরেকেও পাওয়ার প্রত্যাশী। একই রকমভাবে মুসলমানদের জন্য সরকার প্রদত্ত অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সুযোগ- সুবিধা এই অনুদানের রাজনীতিতে ভোটের অঙ্কে ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষকে সুধিবা দিলেও আখেরে দেশের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদের সূচনা করেছে। বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত এই বৈষম্যকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। আসলে শ্রেণীবিশেষের মানুষকে বিভিন্ন রকমের অনুদান দিয়ে খুশি রাখা রাজনৈতিক লাভের জন্য ফলপ্রসু হলেও তা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পরিপন্থী। কীভাবে? সরকারি কোষাগারের অর্থ দিয়ে ব্যক্তি বা সমষ্টিগত কিছু মানুষকে অনুদান দিলে ওই মানুষদের শ্রমবিমুখ করে তোলা হয় ও সেই সঙ্গে সরকারি কোষাগারের যে অর্থ উন্নয়নের জন্য ব্যয় হওয়ার কথা তাও নষ্ট হয়। অনুন্নয়ন কর্মসংস্থনকে ব্যাহত করে এবং অনুদান মানুষকে কর্মবিমুখ করে তোলে। এভাবে সমাজে কর্মবিমুখতার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যবোধেরও অভাব দেখা দেয়। আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা প্রকৃতপক্ষে তাই।

ম্যালথাসিয়ান তত্ত্বের এক অদ্ভুত প্রয়োগ আমাদের দেশে লক্ষ্য করা যায়। সমাজের যে গোষ্ঠীর কাছে সরকারি অনুদান বেশি পৌঁছায় তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাকি অংশের চেয়ে বেশি। এর বড়ো কারণ, অনুদানের নিশ্চিতকরণ যেমন ওই জনগোষ্ঠীকে বংশবৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা করেছে, তেমনই তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য রাজনীতিকরা দেশের উন্নয়নের চেয়ে এদের অনুদান বৃদ্ধি করে 'ভোটযুদ্ধে' জিতে ক্ষমতার মধুভাণ্ড ভোগ করার সহজ সরল পথটাই বেছে নিচ্ছে। ফলে, দেশের খাদ্যভাণ্ডারের উপর চাপ পড়ছে। খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। আবার এইসব প্রক্রিয়ার ফলে এধরনের মানুষের মধ্যে দেশের ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধের বিকাশই হয়নি। এরা ব্যক্তি বা দলবিশেষের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকছে। এর প্রতিফলন আমরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। সংবাদমাধ্যমগুলোর, এমনকী সোশ্যাল মিডিয়া অবধি তাদের সঠিক সংবাদ পরিবেশনের বদলে ব্যক্তিবিশেষে বা রাজনৈতিক দলের প্রচারেই যত্নবান হচ্ছে। সত্য সংবাদকে গুরুত্ব না দিয়ে বা বিকৃতভাবে পরিবেশন করে জনমত গঠন করার মতো অনৈতিক কাজে তারা লিপ্ত থাকছে। অনেক ক্ষেত্রে এদের তথাকথিত সংবাদ পরিবেশন দেশের ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। আগে সমাজে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কথার গুরুত্ব ছিল। কিন্তু এইসব 'বিক্রিত' সংবাদমাধ্যমের প্রচারের ঢক্কানিনাদে তারা 'বুদ্ধিজীবী' তৈরি করেন যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে তাদের দলীয় স্বার্থে মুখখোলা বা কলম ধরা— অন্য সময় তাঁরা কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রামগ্ন থাকেন! আজকাল আবার সব পেশার মানুষজন 'বুদ্ধিজীবী' বলে বিবেচিত হন! সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে ধরে খেলোয়াড়রাও নাকি বুদ্ধিজীবী। এর ফলে এদের বিশ্বাসযোগ্যতাও নষ্ট হয়ে গেছে। এদের কাছে সমাজের সাধারণ মানুষের কোনো প্রত্যাশাও নেই আর এইসব মানুষজনদের কর্তব্য শুধু বুদ্ধি করে নিজের আখের গুছোনোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজ স্বাধীনতার পঁচাত্তরতম বর্ষে এসে দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কোনো রাজনীতিক, কোনো তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বলছেন না যে, আমরা ভারতীয়রা যদি ভারতীয়ত্ব জলাঞ্জলি দিই, তাহলে ভারতের অস্তিত্বই থাকবে না— সেক্ষেত্রে আমাদের কারোরই অস্তিত্ব থাকবে না। আমাদের সমাজের, দেশের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্যবোধ যদি জাগ্রত হয়, আমরা যদি ধর্ম, বর্ণ, জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের ও সমাজের স্বার্থে কাজ করি, তবে আমাদের ভারত আবার 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। এতে কিন্তু ভারতবাসী হিসেবে আমাদের সবার গুরুত্ব বাড়বে। □

বিশেষ নিবন্ধ

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ ও জাতি গঠনের প্রতিমূর্তি কে.এম. মুন্সী

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে আজ এক অশনি সংকেত ঘনিয়ে এসেছে। পেশাদারি রাজনীতির কারবারিরা ক্ষুদ্র স্বার্থে ঘোলা জলে মাছ ধরতে সতত আগ্রহী। মানবিক মূল্যবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতিকে বিপন্ন করতে তাঁদের কোনো কুণ্ঠা নেই। এই পরিস্থিতিতে মনে পড়ল কে.এম. মুন্সীর কথা। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কে.এম. মুন্সী প্রয়াত হন। তখন থেকেই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। ১৯৭৫ সালে নিজের গদি বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো বিধ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার খর্ব করা হলো। রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিল।

পঞ্চাশ বছর পর নৈতিক মূল্যবোধের সংকোচন বহাল রয়েছে তাই নয়, ভারতীয়ত্ব ভাবনার উপরও এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদরা সোচ্চার হচ্ছেন। ভারতের অভিন্ন জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি আঞ্চলিক সত্তার উপর কলরব জোরালো হচ্ছে। আসলে আঞ্চলিকতাবাদের পাশাপাশি জাতপাত, ধর্মীয় বিভেদ জিইয়ে রেখে ভোট ভাগাভাগির অশুভ খেলায় অনেক পেশাদারি রাজনীতিবিদ মেতে উঠেছেন। বন্দে মাতরম্ বা জয়হিন্দ ধ্বনিতে এদের উৎসাহ নেই। 'জয় বাংলা' 'দ্রাবিড় ভূমি' এসব ধ্বনি তুলে আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতায় বসতে চায়। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে এমনই ধ্বনি শোনা গেছে। এমতো পরিস্থিতিতে কে.এম. মুন্সী রচিত 'অখণ্ড হিন্দুস্থান' গ্রন্থটি খুবই প্রাসঙ্গিক। ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার প্রেক্ষিতে মুন্সীজী গ্রন্থটি লেখেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনার উপর এক ভয়ানক আঘাত বলে চিহ্নিত করেন।

কে.এম. মুন্সী (১৮৮৭-১৯৭১) ছিলেন দেশপ্রেমিক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও সুদক্ষ

প্রশাসক। আধুনিক গুজরাটি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মুন্সীজী কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ইতিহাস সবক্ষেত্রেই স্মরণীয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান বিস্ময়কর। দেশীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি ভারতীয় বিদ্যাভবন নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভারতজুড়ে এর শাখা প্রশাখা রয়েছে। তিনি বিদ্যাভবনের প্রাণপুরুষ ছিলেন এবং 'কুলপতি' নামে সম্বোধিত হন। এছাড়া তিনি ভারতীয় ইতিহাস সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় ইতিহাসবিদদের লেখায় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এবার আসি কে.এম. মুন্সীর বহুমাত্রিক অবদানের আলোচনায়। উনিশ শতকের নবজাগৃতি প্রসূত মানসিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ঐতিহ্য কে.এম. মুন্সীর মনন ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক সমন্বিত অবয়ব ধারণ করেছিল। তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে তিনটি ধারার সমাবেশ ঘটেছিল। মানসিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বরোদা কলেজে তাঁর শিক্ষক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ অরবিন্দ ঘোষের প্রভাব পড়েছিল। এরপর জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। পরিশেষে স্বাধীন ভারতের নির্মাণে তিনি ছিলেন সর্দার প্যাটেলের সহযোদ্ধা। গুজরাটের ব্রোচ অঞ্চলে এক স্বচ্ছল পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন (৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৭)।

> **মুন্সীজী জনসঙ্ঘের সদস্য ছিলেন না সত্য, কিন্তু মতাদর্শক্ষেত্রে তিনি জনসঙ্ঘের সঙ্গে একাত্মবোধে সংযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধনে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের তিনি ছিলেন অগ্রণী প্রবক্তা।**

ব্রোচে স্কুল জীবন শেষ করে তিনি বরোদা কলেজে ভর্তি হন। বরোদা কলেজে গ্রাজুয়েট ও আইনে এলএলবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখানেই শিক্ষাগুরু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মানসিক চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলেন। এরপর শুরু আইন ব্যবসা। কর্মক্ষেত্রে মুম্বাই। এখানেই তিনি গুজরাটিদের গুর্জর সভায় যোগদান করেন। আইন ব্যবসায়ের পাশাপাশি সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। বোম্বাইয়ে থাকার সময় সেখানে হোমরুল লিগের সচিব হন। একই সময়ে বোম্বাই হোমরুল লিগের সভাপতি ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের অগ্রগণ্য আইনজীবী মহম্মদ আলি জিন্না। সাহিত্য, আইনজীবী ও রাজনীতি সবদিকেই তিনি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট হন।

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে মুন্সী কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তবে তাঁর কার্যকলাপে ছেদ পড়েনি। গুজরাট সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি ও সভাপতি হিসেবে সাহিত্যের প্রসারে নজর দেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হন। ১৯২৭ সালে বোম্বাইয়ের আইন পরিষদের সদস্য হন। পরের বছর তিনি গুজরাটের বারদৌলি তালুকে কৃষকদের উপর খাজনার হার বাড়ানো হলে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেন। বারদৌলি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। প্যাটেলের সঙ্গে মুন্সীজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাড়তি খাজনার হার মুকুব করার দাবিতে সমস্ত বারদৌলিতে কৃষক

সমাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে শামিল হলো। মুন্সীজী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বোম্বাইয়ের গভর্নরকে পত্র দিলেন (জুন ১৯২৮)। জানিয়ে দিলেন এখানে সর্দার প্যাটেলের শেষ কথা এবং সমস্ত প্রশাসনিক কাঠামো অচল হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো। গান্ধীজী বল্লভভাইকে 'সর্দার' নামে অভিষিক্ত করলেন। এ সময় থেকেই মুন্সীজী গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে মুন্সীজী কারাগারে আবদ্ধ হন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলিতে স্বশাসন বিধান চালু হয়। এরপর ১৯৩৭ সালে মুন্সীজী অবিভক্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হলেন। জাতীয় কংগ্রেস বোম্বাইয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে এবং মুন্সীজী প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে আসীন হন। তাঁর মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যে সুরাপানে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়। পাশাপাশি তিনি সাহিত্যিক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখেন। ১৯৪০ সালে 'জয় সোমনাথ' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সুলতান মামুদের গুজরাট আক্রমণ ও সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের কাহিনি পরিবেশিত হয়।

এদিকে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধকালীন সময়ে নিরাপত্তা রক্ষায় হিংসার প্রয়োগের বিরোধিতা করে। মুন্সী কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে সহমত হননি। তাই কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন। অন্যদিকে ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবি জানালে মুন্সীজী এর বিরুদ্ধে অখণ্ড হিন্দুস্থানের দাবিতে প্রচার শুরু করেন এবং অখণ্ড হিন্দুস্থান নামে এক প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগ না দিলেও কারাবন্দি মানুষদের মুক্তির জন্য আইনি সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন।

এরপর ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে মুন্সীজী কংগ্রেসে যোগদান করেন। সর্দার প্যাটেলের উদ্যোগে তিনি সংবিধান সভার সদস্য হন। অচিরে তিনি সংবিধান খসড়া প্রণয়ন কমিটির সদস্য হন এবং সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন ভারতের নির্মাণে কে.এম. মুন্সী প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমত, সংবিধান খসড়া রচনা কমিটির অন্যতম শীর্ষ সদস্য হিসেবে ভারতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর সৌধ রচনার জন্য তাঁর ভূমিকা বি. আর. আম্বেদকরের মতোই স্মরণীয়। প্রাদেশিক রাজ্যগুলির ক্ষমতা চিহ্নিতকরণ ও দেশের স্বার্থে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন কতটা জরুরি তা সহজেই অনুমেয়। তাই ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রায় সমতুল (Quasi Federal) শাসন বিধি আবশ্যিক ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের পাঁচ শতাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ অঙ্গরাজ্যগুলিকে ভারতের মধ্যে অঙ্গীভূত করার দুরূহ ও ক্ষিপ্র কর্মপ্রয়াসে উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তাঁর দীর্ঘ দিনের সহযোগী ও সহযোদ্ধা কে.এম. মুন্সী। সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ ছিল মুসলমান শাসক নিজামের নিয়ন্ত্রণে। নিজাম ও তাঁর অনুচরবর্গ ভারত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। পাকিস্তান ও ব্রিটেনের প্ররোচনায় নিজাম ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। প্যাটেল তাঁর সহযোগী কে.এম. মুন্সীকে হায়দরাবাদে এজেন্ট জেনারেল পদে নিয়োগ করলেন। প্যাটেল-মুন্সী দ্বৈত প্রয়াসে নিজামের শক্তিক্ষয় শুরু হলো। তাঁর সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারে জনজীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। সর্দার প্যাটেল নথিপত্র সংকলন (correspondence) থেকে দেখা যায়, মুন্সীজী কীরকম বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি বিচার করে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিতেন। পরিস্থিতি এতটা ভারত বিরোধী হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত ভারত সামরিক হস্তক্ষেপ নিতে বাধ্য হয় (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)। প্যাটেল-মুন্সীর বিচক্ষণতার ফলে স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান হলো। অন্যদিকে ভাবুন কাশ্মীরের কথা। আজও কাশ্মীর ভারতের গলার কাঁটা। আসলে কাশ্মীরের বিষয়টি ছিল বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্বে ও নেহরুর নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রনীতি সঠিক না হলে কেমন মাশুল দিতে হয় তা আমরা বুঝতে পারছি। কখনও ব্রিটেন, কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার এখন চীনের উস্কানিতে পাকিস্তান তাণ্ডব চালিয়ে এসেছে।

কে.এম. মুন্সী হায়দরাবাদের গুরুদায়িত্ব পালনের পর এবং সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ভারতে খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। বৈদেশিক আমদানির উপর ভারত বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। সমস্যার সমাধানে কে.এম. মন্সী তিন ধরনের উদ্যোগ নিলেন। এগুলি হলো আরও খাদ্য ফলাও (Grow More Food)। ভূমি সংরক্ষণের জন্য বনমহোৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বন সৃজন পরিকল্পনা ও জলসেচ ব্যবস্থা। তাঁর সময়েই গ্রাম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় কৃষিক্ষেত্রকে বেশি গুরত্ব দেওয়া হয়।

১৯৫০ সালে মুন্সীজীর সভাপতিত্বে সোমনাথ মন্দির সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়। সুলতান মামুদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলায় এই সুপ্রাচীন মন্দিরটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সর্দার প্যাটেল এই মহান কর্মোদ্যোগকে সমর্থন জানান। পুনর্নির্মাণের পর মন্দিরটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাজেন্দ্র প্রসাদ। নেহরু রাষ্ট্রপতিকে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ অবশ্য সেই পরামর্শ মানেননি।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। মুন্সীজী এতে অংশ নেননি। তবে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল পদে আসীন ছিলেন। রাজ্যপাল পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে মন দেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় বিদ্যাভবন দেশজুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ও শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করে।

এদিকে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য ও অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদের বিরুদ্ধে সি. রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে জনমত গড়ে উঠতে লাগল। ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মুক্ত অর্থনীতির ধারণার উপর স্বতন্ত্র দল গঠিত হলো। রাজাজী এর কর্ণধার ছিলেন আর তাঁর সহযোগী ছিলেন কে.এম. মুন্সী, এন.জি.রঙ্গ, মিনু মাসানি প্রমুখ। কে.এম. মুন্সী স্বতন্ত্র দলের সহ-সভাপতির দায়িত্ব নেন। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র দল, ভারতীয় লোকদল ও সংগঠন কংগ্রেসের মিলিত প্রচেষ্টায় জনতা পার্টি গঠিত হয় এবং জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৭১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে মুন্সীজী পরলোক গমন করেন। জনসঙ্ঘ সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী শোকবার্তায় বলেন যে, মুন্সীজী জনসঙ্ঘের সদস্য ছিলেন না সত্য, কিন্তু মতাদর্শক্ষেত্রে তিনি জনসঙ্ঘের সঙ্গে একাত্মবোধে সংযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধনে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের তিনি ছিলেন অগ্রণী প্রবক্তা।

(লেখক শিক্ষাবিদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভস-এর প্রাক্তন অধিকর্তা)

ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের কয়েকটি নমুনামাত্র

অমলেশ মিশ্র

ঔরঙ্গজেব তার রাজত্বকালে ১৬৫৮-১৭০৭ কত শত মন্দির ধ্বংস করে তার উপর যে কত শত মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিল— সে বিষয়ে জীবনীকার লেখকদের লেখা অনেক পুস্তক আছে। এই ছোটো প্রবন্ধে সেগুলির দু'একটির উল্লেখ করার চেষ্টা মাত্র।

দেখা যাবে যে মন্দির ধ্বংস ও দেবমূর্তি লাঞ্ছনা করার ব্যাপারটা ঔরঙ্গজেবের এত প্রবল ধর্ম-প্রেরণার অধীন ছিল যে, কেশবদেব বা বিশ্বনাথ কোনোটিই কোনো বিশেষ কাজ ছিল না। কোরান ও সুল্লাহ্ তাকে অংশবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে বলেছে— সে নিজেকে আল্লাহ্ ও মহম্মদের নিষ্ঠাযুক্ত সেবক মনে করত। ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রত্যেক প্রদেশেই তার হিন্দু অত্যাচার, ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ও দেবমূর্তির উপর আক্রমণের দীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকরাই তা নিজভাষায় লিখে রেখে গেছেন। অবিশ্বাসীদের (অমুসলমান, ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন) উপর আক্রমণের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ই দিয়েছেন এবং নবি স্বয়ং তাঁর জীবনকালে হাতে-নাতে করে দেখিয়েছেন। বলা হয়— In the Quran Allah speaks through Mahammad; in the Sunuah, tleacts through him অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর কথা মহম্মদের মাধ্যমে কোরানে বলেছেন, আর কাজ করে দেখিয়েছেনও মহম্মদের মাধ্যমে (মহম্মদ যা করেছেন তাই সুন্নাহ্-আল্লার কাজ)। মহম্মদ যা করেছেন তাই সুন্নাহ্। মুসলমানদের সেই সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে হবে মাত্র। তাই বলা হয়— মুসলমানদের আক্কেল দরকার নেই কেবল নকল অর্থাৎ অনুসরণ করার দরকার।

মাশির-ই-আলমগিরি— পুস্তকের রচয়িতা সাকি মুস্তাদ খান।

১৭১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুস্তকটি সম্পূর্ণ করেন এনায়েত উল্লাখান কাশ্মীরিয় তাসাদায়। এই এনায়েত উল্লা ছিলেন ঔরঙ্গজেবের নিজের লোক, খুব প্রিয় এবং একজন সেক্রেটারিও বটে। এনায়েত উল্লা তাঁর এই পুস্তকে— মাশির-ই-আলমগিরিতে যা সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি রাজ্যগুলির মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত।

এই পুস্তকে ঔরঙ্গজেবের আদেশবলীর অনেকগুলিই পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক আদেশ থাকলেও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একটি আদেশ সকলের ক্ষেত্রেই ছিল। এরকম একটি ছিল এই রকম :

পরম বিশ্বাসী সম্রাট জানতে পারলেন যে টাট্টা, মুলতান এবং বিশেষ করে বারাণসীতে, 'অবিশ্বাসী' ব্রাহ্মণেরা তাদের বিদ্যালয়ে যাবতীয় মিথ্যা পুস্তক পড়াচ্ছে এবং দূরদূরান্ত থেকে হিন্দুরা ও মুসলমানরা আসছে সেই সব বিদ্যালয়ের অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণদের কাছে এবং একান্ত ঘৃণ্য জ্ঞান অর্জন করছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী সম্রাট সমস্ত প্রদেশের শাসকদের ওইসব বিদ্যালয় ধ্বংস করে দিতে আদেশ দিলেন। আরও আদেশ দিলেন যে, অবিশ্বাসীদের যাবতীয় ধর্মচর্চা ও ধর্মাচরণ যেন ধ্বংস করা হয় (ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ)

১৬৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর বারাণসী মন্দির ধ্বংস করে ঔরঙ্গজেব। ১৬৭০ সালের জানুয়ারিতে মথুরার কেশবদের মন্দির ধ্বংস করে। উল্লিখিত পুস্তকে বলা হয়েছে— খবর এল যে সম্রাটের আদেশ অনুসারে, তাঁর কর্মচারীরা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেছে।

এই পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে যে রমজান মাসে সম্রাট আদেশ দিলেন মথুরায় কেশবরাই মন্দির ধ্বংস করার। কর্মচারীরা কঠোর পরিশ্রমে শীঘ্রই অবিশ্বাসীদের কঠিন ভিত্তি যুক্ত (Strong foundation of in fidelity) ওই মন্দির ধ্বংসের কাজ সম্পন্ন করল। ওই স্থানেই (on its sites) বহু অর্থ ব্যয়ে এক বিশাল মসজিদ নির্মিত হলো। যাবতীয় ছোটোবড়ো রত্নখচিত দেবমূর্তি যা পাওয়া গেল সবই আগ্রায় আনা হলো এবং বেগমসাহেবার মসজিদে উঠার সিঁড়িতে প্রথিত হলো যাতে সেগুলি পদদলিত হয়। মথুরার নাম পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হলো ইসলামাবাদ।

ওই পুস্তকে ঔরঙ্গজেবের গুণগান করে বলা হয়েছে যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় হানাফি সম্প্রদায় (গোঁড়া সুন্নি সম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠা পেল— সে রকমটা হিন্দুস্থান আগে কখনও দেখেনি। কলমের এক খোঁচায় হিন্দুকর্মচারীদের বরখাস্ত করা হলো সমস্ত সরকারি দপ্তরখানা থেকে। অবিশ্বাসীদের অসংখ্য ধর্মস্থান ভেঙে দেওয়া হলো— সেইসব স্থানে বিশাল বিশাল মসজিদ নির্মিত হলো। সকলে এইসব কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

ফতুয়াত-ই-আলমগিরি : ঈশ্বরদাস নাফর। ইনি গুজরাটি ব্রাহ্মণ। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রধান কাজির অধীনে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করেন। পরে গুজরাটের শাসক সুজাত খানের অধীনে যোধপুর পরগনায় একজন আমিন নিযুক্ত হন। তার কোনো কাজেই তাকে হিন্দু বলে শনাক্ত করা যেত না। তিনি প্রত্যেক হিন্দুকেই যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গেছে, তাকে নরকে পাঠিয়েছেন আর মুসলমান যারা মারা গেছেন তাদের শহিদ আখ্যা দিয়ে স্বর্গে পাঠিয়েছেন। তাঁর লিখিত ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস ফতুয়াত-ই-আলমগিরিতে ১৬৫৭ থেকে ১৭০০ সাল পর্যন্ত লেখা আছে।

মথুরা প্রসঙ্গে লিখেছেন— সম্রাটের বাহিনী যখন হিন্দুদের পবিত্র মথুরায় শিবির করেছিল, মথুরা মন্দিরের কাণ্ডকারখানা সম্রাটের গোচরে আনা হলো। তিনি ফৌজদার আবুল নবীখানকে ওই মন্দির ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই স্থানের উপর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন।

সামান্য ইতিহাস ও কিছু মন্তব্য : মুসলমানরা ভারতের যে অংশে এবং যেকালেই শাসক হোক না কেন, ,তাদের মধ্যে কখনও সামান্যতম ভারতীয়তা দেখা যায়নি। তাদের অনুপ্রেরণা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ছিল একান্ত অভারতীয়।

সীতারাম গোয়েল তাঁর গ্রন্থে এই কথাগুলি বলেছেন। আরও বলেছেন, এক দল দস্যু বা ঠ্যাঙ্গাড়ে যারা গায়ের জোরে আমার ঘরে ঢুকে বসে আছে তারা কখনও আমার পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয় না। যতদিনই আমার বাড়িতে থাকুক না কেন এবং আমার সম্পদে পেটমোটা করুক না কেন, তারা কখনও নৈতিক ও আইনগত অধিকার পায় না। শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই আমি তাদের আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব।

ইসলামের পক্ষ থেকে ভারত প্রথম আঘাত পায় ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে নবি মহম্মদের মৃত্যুর ২ বছর পরে। ৬৩৪ সালে আক্রমণটি ছিল জলপথে। তখন খলিফা ছিল ওমর। আক্রমণটি ঘটে মহারাষ্ট্রের উপকূল অঞ্চলে। পরবর্তী যাবতীয় মুসলমান আক্রমণ হিন্দুদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়। তাদের সেনাপতিরাও নিহত হয়।

দীর্ঘ ৭৮ বছর পরে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি আক্রমণ কিছুটা সফল হয়। সিন্ধ, সুলতান ও পঞ্জাবের কিছু অংশে তারা দখল পায়। যদিও তারা মালোয়া, গুজরাট এবং ভারতের ভিতরদিকে আক্রমণ করেছিল। দিল্লি, রাজস্থান, মালোয়া এবং গুজরাটে তারা পরাজিত হয়েছিল। মুলতান ও মনসুরাতে ইসলামি সৈন্য-সামন্তদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

জাবুল ভকত থেকে আক্রান্ত হতে থাকলেও ৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারা প্রতিহত করেছিল। ওই সালে পারস্যের সাফারিদ বংশের আক্রমণে জাবুল বরাবরের জন্য ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেখানের সমস্ত হিন্দুই মুসলমান হতে বাধ্য হয়। সাফারিদদের পরে সামানিদরা (বুখারার) আসে। তারা ৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে গজনি দখল করে। এই গজনি থেকেই বারংবার ভারত আক্রান্ত হতে থাকে।

প্রায় পাঁচশো বছর ধরে হিন্দুরা লড়াই করে চলেছিল। ইসলামকে প্রতিরোধ করার শক্তি ইসলাম থেকে মুক্ত হওয়ার যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। যদি ব্রিটিশ ইসলামকে বাঁচানোর চেষ্টা না করত, তাহলে ভারতে ইসলাম আক্রমণ কেবলমাত্র গল্প বই হয়েই থাকত এবং ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু (মুসলিম) সমস্যা নামে কোনো সমস্যাই থাকত না। ▌

দেশের প্রতি কর্তব্যবোধই নাগরিক জীবনের সার্থকতা

নিখিল চিত্রকর

আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। দেশ আমাদের সুষ্ঠু জীবন ধারণের অধিকার দিয়েছে। আমরাও দেশের সংবিধানে উল্লিখিত যাবতীয় মৌলিক অধিকার ভোগের পক্ষে সওয়াল করে থাকি। কেন্দ্র সরকারের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেই সুর চড়াই। কিন্তু ভুলে যাই, দেশের প্রতি আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। মহাত্মা গান্ধীর অভিমতে, অধিকার মানে শুধু ভোগ নয়, 'অধিকার মানেই হলো কর্তব্যগুলির সুসম্পাদন।

ইদানীং শারীরিক অসুস্থতায় কোনো মানুষ যখন রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করেন, কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। পথ দুর্ঘটনাগ্রস্ত কারো সাহায্যের জন্য কেউ ছুটে আসেন না, পুলিশি ঝামেলায় পড়ার দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যান। অথচ দুর্ঘটনার চলমান ছবি মোবাইল ফোনে ক্যামেরাবন্দি করতে কেউ ভোলেন না। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় যত দ্রুত ছবি ছড়িয়ে পড়ে ততটা সংবেদনশীলতা নিয়ে কেউ বিপদের সময়ে ছুটে আসেন না। এটা কর্তব্য অবহেলার একটা নিন্দনীয় ছবি। এর পরিবর্তন হওয়া উচিত।

দেশের প্রতি কর্তব্য ও নিষ্ঠা কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর একটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালে ইউনেস্কোর তৎকালীন মহানির্দেশক ড. জুলিয়ান হাসক্লে'র একটি চিঠির জবাবে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা নিজেদের জীবনের অধিকারগুলি তখনই অর্জন করতে পারি, যখন নাগরিক হিসেবে নিজেদের কর্তব্যগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করব।'

ছোটো ছোটো সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের সোপানগুলি পেরিয়ে যাওয়া যায়। ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘন না করে, রাস্তাঘাটে ময়লা আবর্জনা না ফেলে, অতিমারীর সময়ে মাস্ক পরে রাস্তায় বেরোনোর মাধ্যমেও দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় দেওয়া যায়।

পারস্পরিক সহযোগিতাও একটি মুখ্য বিষয়। স্বাধীনতাপূর্ব যুগে বহিঃশত্রুর আক্রমণে যখন ভারত বিপর্যস্ত হয়েছে, দেশীয় রাজারা নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। আবার আবার কেউ কেউ বিদেশি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছেন। পারস্পরিক সহযোগিতা ভারতের সনাতন সংস্কৃতির অঙ্গ। বিশেষ করে আজকের দিনে পরস্পরের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ জাতীয় ঐক্যের নামান্তর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার পরিধি ছিল আরও বড়ো। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণ যখন একে অপরের সঙ্গী হয়ে উঠবে, তখন সকলের জীবন একই লক্ষ্যে, নতুন প্রেরণায় জাগ্রত হবে এবং এরই সঙ্গে গড়ে উঠবে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, উন্মোচিত হবে এক নতুন দিগন্ত, উন্মেষ ঘটবে এক নতুন দৃষ্টির। এই বিপ্লব যেদিন আসবে সেদিন জনগণ এক পরিবর্তিত জনগণে পরিবর্তিত হবে।' স্বাধীন ভারতে নেতাজীর এই পারস্পরিক সাহচর্যের বাণী মনে রাখা প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছিলাম একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে জয়েন্টে পাশ করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু পরিবারের সামর্থ্য নেই মেয়েটিকে ডাক্তারি পড়ানোর। অনেকের কাছে দরবার করার পরে কোনো এক ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েটি ডাক্তারি পড়তে সমর্থ হয়েছে। এমনটাই আমাদের দায়িত্বশীল নাগরিকদের কর্তব্য।

অসমের রাজ্যপাল শ্রীজগদীশ মুখী তাঁর একটি বক্তব্যে বলেছিলেন, ‘জীবনে পাঁচজন বন্ধু রাখুন। বিপদে-আপদে, আনন্দে-উৎসবে এই পাঁচজনের পাঁচটা পরিবার একত্রিত হয়ে থাকবে। এই ধারণাটা ছড়িয়ে দিন। দেখবেন মানুষ পরস্পরের সহযোগিতায় সুস্থ সমাজ গঠন করবে।’ আমাদের দেশ প্রতিটি নাগরিকের কাছে এই পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করে।

‘আও বাচ্চে তুমহে দিখায়েঁ মিট্টি হিন্দুস্থান কি/ইস মিট্টি মে হরেক মিট্টি হ্যায় বলিদান কি’— ছোটোবেলা এই হিন্দি গানটি আমাদের খুব আকর্ষণ করত। বাড়ির বড়োরা গানের বাংলা তর্জমা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন বুঝেছিলাম আমাদের স্বাধীনতা সহজে আসেনি। অনেক রক্তপাতে, বহু প্রাণের বিনিময়ে এসেছে ভারতের স্বাধীনতা। আর সেই সংগ্রামে একাকার হয়েছে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ। এই অনুভূতি দেশাত্মবোধ আনে।

আমরা প্রত্যেকেই দেশপ্রেমী। ভারতের খেলা দেখে উদ্বুদ্ধ হই। সমর্থনে গলা ফাটাই। তবু কখনও এলাকা বিশেষে কেউ কেউ ভিন দেশের পতাকা নিয়ে পেশীশক্তির প্রদর্শন করে। জাতীয় ঐক্যকে কালিমালিপ্ত করে। কলেজে পড়াকালীন একজন প্রফেসর দেশাত্মবোধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জাপানের উদাহরণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমেরিকা জাপানে পরমাণু বোমা ফেলার পর দীর্ঘ বছর ধরে সে দেশের মানুষকে আমেরিকার একটা সূঁচ পর্যন্ত কেনাতে পারেনি। দেশপ্রেম এমনটাই হওয়া উচিত। গালওয়ান উপত্যকায় চীনা সৈন্যের সঙ্গে সংঘাতে ভারতীয় জওয়ানদের বীরগতি প্রাপ্ত হওয়ার পর চীনা দ্রব্য ও মোবাইল অ্যাপ বর্জন আমাদের গভীর দেশপ্রেমেরই নিদর্শন।

যে ভারত হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আজও অক্ষয় হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে, ভারত নামের যে রাষ্ট্রের ধারণা ঐক্য ও শান্তির অখণ্ড ভূমি, সেই বৈদিক যুগ থেকে যে ভারত বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করেছে বিজ্ঞন ও গবেষণার অভিনব সব দিগন্ত, সেই ভারতের গর্বিত নাগরিক হিসেবে এই বিশেষ দিনটুকুতে দায়সারা উদ্‌যাপন ছাড়া আরও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য বর্তায় আমাদের উপরে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অখণ্ড ভারতের ধারণায় আস্থা রাখা। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার কর্তব্য একটি গুরুদায়িত্ব। অথচ অখণ্ড ভারতের ধারণা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জেরে। স্বায়ত্তশাসনের মোড়কে থাকা রাজ্যগুলি আঞ্চলিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশকেই ভেঙে ফেলছে বহু খণ্ডে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বহুলাংশে নিজ নিজ রাজ্যের ভালো থাকার বিষয়টিই বেশি গুরুত্ব পায় এবং সেটা করতে গিয়ে অন্য ভাষা, অন্য রাজ্যের মানুষের প্রতি যে সম্মান দেখানো প্রয়োজন, সেই আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে। তাই সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের এক সাংসদ যখন পার্লামেন্টে কাউকে ‘বিহারি গুন্ডা’ বলে আক্রমণ করেন, আঘাতটা কোনও রাজনেতার গায়ে লাগে না, আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা।

এই প্রাদেশিকতা সম্পন্ন রাজনৈতিক মানসিকতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভারতের অখণ্ডতা। একটা কথা ভুললে চলবে না, দেশ গঠনের কারিগর যাঁরা, তাঁরা নির্বাচিত হন জনগণের ভোটে। অতএব তাঁদেরই নির্বাচন করুন, যাঁরা ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এ বছর চুয়াত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করবে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত। জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, স্বদেশ জাগরণের চেতনায় আপ্লুত হয়ে আবারও আমরা সফর করব স্বাধীনতা সংগ্রামের ফেলে আসা ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলোতে। দেশাত্মবোধক সংগীতে উদ্বুদ্ধ করব অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা দেশপ্রেমের উষ্ণ প্রস্রবণ।

সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে-দেওয়ালে তেরঙ্গা। জন- গণ-মনের নেপথ্য জাতীয়সংগীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবির ঢল। এটুকুতেই থেমে না গিয়ে দেশের প্রতি ছোটো ছোটো কর্তব্য পালন করে প্রতিটি স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখি।

যে ভারত হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আজও অক্ষয় হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে, ভারত নামের যে রাষ্ট্রের ধারণা ঐক্য ও শান্তির অখণ্ড ভূমি, সেই বৈদিক যুগ থেকে যে ভারত বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করেছে বিজ্ঞন ও গবেষণার অভিনব সব দিগন্ত, সেই ভারতের গর্বিত নাগরিক হিসেবে এই বিশেষ দিনটুকুতে দায়সারা উদ্‌যাপন ছাড়া আরও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য বর্তায় আমাদের উপরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, ‘আসুন, আমরা সবাই এই সংকল্প শক্তি নিয়ে মিলেমিশে ভারতের এক-একজন দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে নিজেদের কর্তব্য পালন করি।’ □

দেশ ভাগের যন্ত্রণা

এইতো সেদিন নবতিপর বৃদ্ধ সাথে কথা
বৃদ্ধ শোনায় দেশ ভাগের দুঃখ অভিজ্ঞতা।
বাড়ি ছিল মৈমনসিংহ, ত্রিশাল থানায়
একদিন এক বর্গাচাষি চুপিসারে জানায়
'কর্তাবাবু এদেশ ছেড়ে পালান তাড়াতাড়ি
নইলে ওরা জ্বালিয়ে দিবে পোড়াবে ঘরবাড়ি।'
এটাই তখন রীতি রেওয়াজ পূর্ব পাকিস্তানে
হিঁদুর বাড়ি দখল করে মত্ত মুসলমানে।
সময়টা সেই পাঁচের দশক স্বাধীনতার পরে
মা-বোনের ধর্ম লুট হিঁদুর ঘরে ঘরে।
সাত পুরুষের ভিটে মাটি, মায়ার বন্ধন
সকল ছেড়ে পলায় যখন, সবার ক্রন্দন
আকাশ ফুঁড়ে উঠেছিল, হেসেছিল ওরা
'এ দেশ ছেড়ে যা পালিয়ে, পালিয়ে যা ত্বরা।'

আজকে যারা বুদ্ধিজীবী, ভুলেছে সেদিন
এমনি কী আর বঙ্গ হিঁদুর অবস্থা সঙ্গীন
সিএএ-র বিরোধিতা করছে যারা আজ
স্মৃতিহীন ভুলেই গেছে পূর্বজনের লাজ।

—অশোক কুমার ঠাকুর,
কামেশ্বরী রোড পূর্ব, কোচবিহার।

ইসলামিক বাঙ্গলা

নয়ন মুদিলে আজ দেখি বারে বার
সনৎ-শ্যামার বাঙ্গলাতে আর হিন্দু র'ল না আর।
কোথায় নলিনী ঘোষ আর কোথায় সূর্য কুমার
এই বাঙ্গলায় ঠাঁই নেই আর তোমার আমার।
দেশকে স্বাধীন করতে যত, ফাঁসিতে লটল কেবলই হিন্দু
সেই বাঙ্গলায় র'ল না তার শেষ যে রক্তবিন্দু।
দিব্যজ্ঞানী মহাজন সব কোথায় তোমার শিকড়
ঝড় বন্যায় ভাঙেনি উড়েনি, তবুও র'ল না সাত পুরুষের ঘর।
তোমরা তাড়ালে ব্রিটিশ শক্তি, তোমারে বধিলে এ কোন শক্তি
বিশ্বজয়ী বাঙ্গালি বাবুর নেইকো যে আর আজ জাতির ভক্তি।

....

অতুল থেকে নির্মল আর সাধুলেগোঁয়ারের তারকেশ্বরের সভা
বিমল থেকে মনুজেরা বলে, বাঙ্গালি রহিল শুধুই বোবা।
নেইকো যুগলকিশোর আর নেইকে গোপাল পাঁঠা
লক্ষ্মণ সেনের সোনার বাঙ্গলায় আঘাত হানিল পুনঃ বক্তিয়ারের ব্যাটা।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

ভোটার হতে গেলে দেশের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়

আমাদের ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আঠেরো বছর বয়স পূর্ণ হলে যে কোনো নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারী। নিয়ম অনুযায়ী তিনি (ছেলে বা মেয়ে) ভোটার তালিকায় নাম করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ে ভোটাধিকর প্রয়োগ করতেও পারবেন। এটাই নিয়ম এবং স্বাভাবিক। যেহেতু একটা ভোটও হার-জিত নিশ্চিত করে, তাই প্রতিটা ভোটই অত্যন্ত মূল্যবান। দেশ নির্মাণের এই চাবি যাঁদের হাতে তাঁদের নিশ্চয়ই কিছু জিনিস জানা থাকা ভালো। তাই নিয়ে কয়েকটি কথা।

(১) ইতিহাস জ্ঞান : অন্ততপক্ষে ১২০০ বছরের বা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসটা জানা থাকা প্রত্যেক ভারতবাসীর (কম বেশি) খুব দরকারি। বিশেষ করে এই সময় কালের প্রথম এক হাজার বছর দেশীয় নৃপতিদের দেশ শাসন এবং বহিঃশত্রুদের ভারত আক্রমণ ও ক্রমান্বয়ে দেশ দখল, শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি জানা ভীষণ প্রয়োজন। (২) ভূগোল : কোন কোন অঞ্চল নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত ছিল, তাদের মধ্যে অনেক অঞ্চল ১৯৪৭-এর পর ভারতের সঙ্গে নেই কেন? (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান : প্রতিবেশী দেশগুলি ভারতকে কীভাবে চায়? এবং ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক চায় এটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝা। (৪) পৌরনীতি বা পুরনীতি এবং দর্শন : ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ, ভবিষ্যতে কোন পথে এগোলে ভারতের মঙ্গল। এ সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে হবে।

প্রয়োজনে এসবের উপর পুস্তক বা সিলেবাস রচনা করা যেতে পারে। যোগ্য শিক্ষকের সাহায্যে কোনো বিদ্যাঙ্গনে নবীন ভোটারদের পাঠ দান করা হোক। পাঠদান শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। নির্দিষ্ট যোগ্যতামান অর্জন করতে পারলেই নবীন নবীন ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

—অজয় বিশ্বাস,
বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

ফঃ ৩

শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনে নিজের কিছু করণীয়

ডাঃ এম. এল. চৌধুরী

জীবনে অনেক প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি— আমি একজন ডাক্তার। করোনা মহামারীর মহাযুদ্ধে সামনের সারিতে থাকতে চাইলেও বয়সজনিত কারণে সম্ভব হয়নি। আমি এমন কোনো বিখ্যাত চিকিৎসক বা লেখক নই যে, যে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে পারি। কিন্তু করোনার ভয়াবহতায় বন্ধুর অনুরোধে কিছু কথা—

এখন কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে। এই ভ্যাকসিন নিলেই যে কোভিড সংক্রমণ হবে না এমন ভাবার কোনো কারণ নেই, তবে সংক্রমণের ভয়াবহতা কম হবে এক ও প্রাণহানি ঘটবে না। তাই প্রত্যেকেরই এমনকী গর্ভবতীরাও গর্ভাধারণের ২০ সপ্তাহ পরে ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। তবে ভ্যাকসিন নিলেও মাস্ক পরা, পরিধেয় জামাকাপড় এবং কর্মস্থল স্টেরিলাইজড হতে হবে এবং খাওয়ার আগে সকালে হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রে শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষে কিছু কথা মানব জীবনে অতি মূল্যবান। এর অধিকার কেবল নিজের নয়, মা-বাবা ও বিয়ের পর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরও এবং সমাজেরও। তাই নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করা আপনার কর্তব্য।

রক্তদান— মহাদান। রক্তদানে মরণাপন্ন রোগী যেমন বাঁচে তেমনি রক্তদাতার রক্ত উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলি আরও বেশি সক্রিয় হয়। কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্ক সব সময় প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করতে পারে না। তাই মোবাইল ব্লাড ব্যাঙ্ক যা স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্তের গ্রুপ, নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর-সহ একটি ইনডেক্সড্ ডাইরেক্টরি যার সাহায্যে রক্তদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করে রক্ত পাওয়া সহজ হবে এবং রক্তের অভাবে কেউ মারা যাবে না। উপরন্তু রক্তদাতা ও গ্রহীতা পরিচিত হওয়ার ফলে তাঁদের ও সেই পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে যার ফলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর 'শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর পরিকল্পনা সফল হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ— একটি সরকারি ঘোষণা। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোনো দম্পতির দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান প্রসবের পর পরিবার পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক। এর বিরোধিতা হবে না একটি সন্তানকে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করতে হবে। তাহলে সেই পরিবারে বেকারত্ব থাকবে না, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ও দেশের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশও সুরক্ষিত থাকবে।

অনুপ্রবেশ কিছুতেই নয়, কারণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য আসবে না। এছাড়াও অনুপ্রবেশ তো মুসলমান সমাজের বেশি। এরা গরিব ভারতীয় মুসলমানদের সবেতেই ভাগ বসিয়ে গরিবকে আরও গরিব ও নিজেরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে ভারতীয় মুসলমানদের বদনাম করবে।

বেকারত্ব দূরীকরণে উপযোগী শিল্পস্থাপন ও কৃষিকাজে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

দীর্ঘায়ু হতে ভুরিভোজনে না। কে জানে এই ভোজন শেষ ভোজন কিনা! তাই পরিমাণে কম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। খাবারে বেশি পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল, মাংসের পরিবর্তে মাছ এবং ভজাভুজির পরিবর্তে ছাতু দেওয়া খাবার খেতে হবে। জানা প্রয়োজন, বেশি বয়সে হাই ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদির সম্ভাবনা প্রবল। এগুলি সারে না, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সেজন্য নিয়মিত চেকআপ ও নিজেকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে প্রাতঃভ্রমণ যানবাহনে ব্যস্ত রাস্তায় নয়, কারণ সিএপিডি হতে পারে। পরিবর্তে পার্কে বা বাড়ির ছাদে হাঁটাচলা ও যোগাসন বা ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ কাম্য।

ক্যান্সার মুক্ত ভারতবর্ষ : ক্যান্সার বার্ধক্যের রোগ হলেও যে কোনো বয়সে হতে পারে। এর প্রতিরোধে সচেতন হতে হবে ও কমবয়সি মেয়েদের এইচপিভি টিকা, ৩০ বছর বয়সের পর ক্যান্সার স্ক্রিনিও এবং প্রেসার সুগারে আক্রান্ত স্থূলকায় মহিলাদের এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি কাম্য। ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে বাঁচতে স্নানের সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে 'নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা' পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু যাদের বয়স ৪০ অতিক্রান্ত ও পরিবারে ক্যান্সারের ঘটনা আছে সেইসব মহিলাদের জরায়ু ও ওভারির ক্যান্সারের সম্ভাবনা প্রবল, তাঁদের ওভারি সমেত জরায়ু অপারেশন করে বাদ দিলে ক্যান্সারে যে তাঁর মৃত্যু হবে না এটা নিশ্চিত।

অমরত্ব : মানুষতো মরণশীল কিন্তু ভালো কাজে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই মরণোত্তর অঙ্গদানে অমরত্ব প্রাপ্তি ছাড়াও চক্ষুদানের ফলে মরণের পরেও পৃথিবীর সৌন্দর্য ভোগ করা সম্ভব।

প্রবীণ নাগরিক দেশের সম্পদ। তাদের জন্য সব অফিসেই পৃথক কাউন্টার যেখানে সেই অফিসের সব কাজই সম্পন্ন সহজেই হয়। ৮০-১০০ বছর বয়সিদের সংরক্ষণ ছাড়াও সরকারি আমানত থেকে প্রাপ্ত সুদে সম্পূর্ণ ট্যাক্স ছাড় ও ১০০ বছঠরের ঊর্ধ্বে মানুষদের সবেতেই সম্পূর্ণ ট্যাক্স ছাড়।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‌্যাগিঙের ফলে অনেক মেধাবী ছেলে-মেয়েও সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য হয়। তাই র‌্যাগিঙের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, প্রয়োজনে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাতিল ঘোষণা করা।

বিচার ব্যবস্থা বিলম্বের কারণে অনেক অবিচার হয়। বিচারের জন্য যথাযথ সময় নির্ধারণ।

বিপর্যয় রোধ : যে কোনো বিপর্যয় রোধে 'বিপর্যয় রোধ বাহিনী' গঠন।

রাজ্যপাল চয়ন : নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের উন্নয়নে শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে এবং মোদীজীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এ 'শ্রেষ্ঠ ভারত' পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম ব্যক্তি বিশেষ।

ভিক্ষুকমুক্ত ভারতবর্ষ : সব কুষ্ঠরোগী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের একজায়গায় এনে তাদের যথাযথ চিকিৎসা ও স্বাবলম্বী করতে কর্মশিক্ষা প্রদান।

বুক জ্বালায় সতর্ক থাকতে হবে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ফিশ অ্যান্ড চিপস্। চিকেনকারি, ঝালমশলা ফ্রাই, বিরিয়ানি, রেজালা— এসব খেলে কি বুক জ্বলবে? খাব? ভালো প্রশ্ন। তবে উত্তর এত সহজ নয়। বুকজ্বালা যাকে বলে 'হার্ট বার্ন' ব্যাপারটি হার্ট বা হৃদযন্ত্রের কোনো সমস্যা নয়। বুক থেকে গলা পর্যন্ত জ্বলুনির মতো অস্বস্তি হলো হার্ট বার্ন।

পাকস্থলী ও খাদ্যনালি— এ দুটোর সংযোগস্থলে রয়েছে একটি রন্ধ্রনিয়ন্ত্রক। পাকস্থলীর অম্ল যদি সেই রন্ধ্রনিয়ন্ত্রক দিয়ে গলিয়ে ওপর দিকে উঠে খাদ্যনালি বেয়ে এবং খাদ্যনালিকে উত্তেজিত করে তাহলে বুক জ্বালা হয়।

কিছু কিছু খাবার বুক জ্বালা বাড়াতে পারে :

বুকজ্বালা বাড়ায় : বেশি খাবার, খুব বেশি খাবার বুকজ্বালার ঝুঁকির ব্যাপারে কী পরিমাণ খাবার খাচ্ছেন, সেদিকে নজর দিতে হবে। একসঙ্গে অনেক খাবার খেয়ে ফেলা বুকজ্বালার ব্যাপারে এসব বিচার-বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ। খওয়ার পরিমাণ কমানোর জন্য ছোটো ছোটো প্লেটে খাবেন।

চর্বিবহুল খাবার : চবিবহুল খাবার পাকস্থলীতে থাকে দীর্ঘ সময়, আর যত দীর্ঘ সময় থাকবে, অস্বস্তি হবে তত বেশি। চর্বিবহুল বৃহৎ পরিমাণে খাবার খেলে যেমন, অনেক বেশি ফ্রাইড চিকেন, চিপস, উইংস খেলে দু'রকম ক্ষতি হয়। বেশি খাওয়া হলো আবার বেশি চর্বিও খাওয়া হলো। বুকজ্বালা অনেক বাড়বে।

বুকজ্বালা কমাতে হলে : চর্বি খাওয়া কমাতে হবে। প্রিয় খাবারগুলো যে একেবারে বাদ দিতে হবে, তা নয়। এদের ভিন্নভাবে রান্না করলে, প্রস্তুত করলে প্রশমিত থাকবে বুকজ্বালা। কিছু খাবার তেলে না ভেজে, সেঁকে, আগুনে ঝলসে, গ্রিল করে বা রোস্ট করে খাওয়া যায়। রান্নার রকমফের ঘটিয়ে বুকজ্বালা কমানো যায়, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

বুকজ্বালা বাড়ে : অম্লধর্মী খাবারে। অম্ল খাবার, যেমন— টমেটো, টমেটো সস্, সালসা, সাইট্রাস ফল, কমলালেবু, জাম্বুরা, গ্রেপফ্রুট খালি পেটে খেলে অনেক সময় ঢেঁকুর, বুকজ্বালা হয়।

ভিনিকারও বেশি অম্লধর্মী, তবে এটি তো এমনি খাওয়া হয় না, সালাদ ড্রেসিং ও অন্যান্য ডিশে যোগ করা হয়। এই অম্লধর্মী খাবারটি এড়াতে পারলে ভালো। টমেটো, সাইট্রাস ফল ছাড়া তাজা ফল, সবজি আরও আছে। তবে খেলেও খেতে হবে কম, ছোটো টুকরো। টমেটো সস্ কম নেওয়া হলো, সঙ্গে স্প্যাগোটি, মাংস ও সবজি।

যেসব পানীয় উসকে দেয় বুকজ্বালা : পানীয়র ব্যাপারেও সতর্কতা চাই। এর মধ্যে রয়েছে কফি, ক্যাফিনযুক্ত চা, কোলা অন্যান্য কার্বনেটেড পানীয় ও মদ। ক্যাফিনযুক্ত পানীয় পাকস্থলীতে অম্লরস ক্ষরণ উদ্দীপিত করে এবং মদ্যজাতীয় পানীয় খাদ্যনালীর রন্ধ্রনিয়ন্ত্রককে শিথিল করে। বুকজ্বালা ঘটায়। কোমল পানীয়র সোডা পেট ফাঁপায়, তা থেকে বুকজ্বালা হয়।

অন্য পানীয় গ্রহণ করুন : বুকজ্বালা রোধ করতে হলে এমন সব পানীয় পছন্দ করুন, যেগুলো হিসহিসে, গ্যাসযুক্ত নয়। বিকল্প হলো হার্বাল টি, দুধ বা শুধু জল। খাদ্যের সঙ্গে জল পান করলে পাকস্থলীর অম্লরসও লঘু হবে; বুকজ্বালা হবে কম। ▫

স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরাঙ্গনা ঝলকারী বাঈ

অনামিকা দে

স্বাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক ভারতবাসী যদি পরাধীন ভারতমায়ের গ্লানিময় দিনগুলির মনে করতে পারে এবং সেই মাটির মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা নির্দ্বিধায় ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের প্রতিনিয়ত স্মরণে রেখে পথ চলে, তবেই বোধ হয় একমাত্র সঠিক ভাবে স্বাধীনতার মূল্যায়ন হতে পারে। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' এই গোটা কর্মকাণ্ডে ভারতীয় নারী শক্তির কতটা অবদান ছিল তার কিঞ্চিৎমাত্র ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছে। যে অকুণ্ঠ ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তা স্মরণ না করলে এই সংগ্রামের যে দুর্গম পথ তা অনুভব করতে পারব না আমরা। আজ তেমনি এক নারীশক্তির আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরব অঙ্গনার পাতায়, যা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি।

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আমরা সকলেই জানি। তার সঙ্গেই উঠে আসে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা। কিন্তু উপেক্ষিত থেকে যান ঝলকারীবাঈ। যদিও কয়েকদিন আগে 'মণিকার্ণিকা' চলচ্চিত্রটিতে লক্ষ্মীবাঈয়ের ভূমিকায় কঙ্গনা রানাউতের পাশাপাশি ঝলকারীবাঈয়ের চরিত্রে খুব দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন অঙ্কিতা লোখান্ডে। আজ আমরা বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে ইতিহাসের সেই উপেক্ষিতা ঝলকারীবাঈয়ের আখ্যান ফিরে দেখবো।

ঝলকারীবাঈ তৎকালীন ঝাঁসি রাজ্যের ভোজলা গ্রামে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সাদোভা সিংহ, মা যমুনা দেবী। খুব ছোটোবেলায় তার মা মারা যান। গরিব ও নিম্নশ্রেণীর মেয়ে বলে বিদ্যালয় যাওয়ার সুযোগ ছিল না। শৈশবকাল থেকে অত্যন্ত দামাল প্রকৃতির ছিলেন তিনি। নিজের চেষ্টাতেই ঘোড়সওয়ারি, অস্ত্র চালনা ও তিরন্দাজি শিখেছিলেন। একবার জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঘকে কেবলমাত্র কুড়াল দিয়ে হত্যা করেছিলেন তিনি। এই কথা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে আশেপাশের গ্রামে চোর ডাকাত পড়লে কিংবা কোনো বন্য জন্তু আক্রমণ করলে সবার প্রথমে তাঁর ডাক পড়ত। রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ বিভাগের সেনা অহতিশাম খান ঝলকারীবাঈয়ের সঙ্গে রানির পরিচয় করিয়ে দেন। পরবর্তীকালে এই অহতিশাম খানকেই তিনি বিয়ে করেন। ঝলকারীবাঈয়ের রণদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে ঝাঁসির রানি তাঁকে সেনাবাহিনীর মহিলা শাখায় দায়িত্ব দেন। এখানে তিনি ধীরে ধীরে শেখেন গুলি চালানো ও কামান দাগার কৌশল। রণকৌশলে অত্যন্ত নিপুণা ঝলকারীবাঈয়ের সঙ্গে রানির শারীরিক গঠনগত এতটাই মিল ছিল যে অজানা কেউ চট করে তাঁদের আলাদা করতে পারতেন না। মহাবিদ্রোহের সময়ে জেনারেল হিউ রোজ ঝাঁসি আক্রমণ করে। ঝাঁসির দুর্গের একটি ফটকের দায়িত্বে থাকা দুলাজু বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য দুর্গের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। সভাসদদের পরামর্শে রানি অন্য একটি দরজা দিয়ে পলায়ন করেন। এই সময় ঝলকারীবাঈ রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের ছদ্মবেশে জেনারেল রোজের শিবিরের দিকে রওনা হন ও নিজেকে রানি বলে ঘোষণা করেন। এতে ইংরেজদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, যা সারাদিন অব্যাহত থাকে। ফলে রানি নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যেতে সফল হন।

এই বীর নারীর মৃত্যু নিয়ে খানিকটা বিভ্রান্তি রয়েছে। কারো কারো মতে, তিনি ১৮৫৮ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। আবার কারো মতে তিনি ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। একে তো মহিলা তার ওপর নিম্নশ্রেণীর। তাই ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি চিরকালই উপেক্ষিত রয়ে গেলেন। তবে সাম্প্রতিককালে উত্তর ভারতে ঝলকারীবাঈয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী বিভিন্ন সংগঠন হুতাত্মা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারত সরকারের ডাক ও টেলিগ্রাম বিভাগ ঝলকারীবাঈয়ের ছবি-সহ একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ২০১৭ সালে দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ভোপালে তাঁর একটি মূর্তি উন্মোচন করেন। আশা রাখি আগামীদিনে ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করে থাকবে ঝাসির বীরাঙ্গনা ঝলকারীবাঈয়ের নাম। আগামী প্রজন্ম জানবে তাঁকে, জানবে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীশক্তির অবদানের কথা। ▯

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ভারতীয় সংবিধানকেই আহত করে

সুজিত রায়

বছর দুয়েক আগের ঘটনা। দিল্লির সংখ্যালঘু কমিশন শিক্ষা দপ্তরের কাছে সুপারিশ করে যে, মুসলমান শিক্ষকদের শুক্রবারের জুম্মা নমাজেক জন্য বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করা হোক। কারণ এই নমাজটি সমবেতভাবে করার দায় নাকি মুসলমান সমাজের আছে।

শিক্ষা দপ্তর সুপারিশটি খারিজ করে দিয়েছিল, কারণ এমন দাবি এর আগে কখনও ওঠেনি, কখনও ছুটি দেওয়াও হয়নি। তাছাড়া এমন সিদ্ধান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠনে ব্যাপক ক্ষতি করবে।

উল্লেখ্যনীয় যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর এই সিদ্ধান্ত নিলেও এ প্রসঙ্গে দিল্লির রাজ্য সরকার ও শাসকদল আপ রা কাড়েনি। এমনকী বুদ্ধিজীবীরাও নীরব থেকেছেন। বলেছিলেন মাত্র একজন। তিনি হলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক যোগেন্দ্র যাদব। শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্তকে তিনি স্বাগত জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'যদি দিল্লি সরকারের অন্য কোনো কর্মচারী এমন ছুটি না পান তাহলে শুধু মুসলমান কর্মচারীরা এই বিশেষ সুবিধা পাবেন কেন?' তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদি সমবেত নমাজ বাধ্যতামূলক দায় হয়, তাহলে নমাজের সময়টা নির্ধারিত হতে পারে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় অথবা স্কুল ছুটির পরে বা আগেও তা করা যেতে পারে। যোগেন্দ্র যাদবের এই তার্কিক দর্শন সমন্বিত মন্তব্যকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় বয়ে যায়। শুধু বিরোধী আক্রমণ এসেছিল মুসলমানদের তরফ থেকেই এমনটা নয়। বহু হিন্দু মানুষজন শ্রীযাদবকে বিশ্রী ভাষায় আক্রমণ করেছিল এই বলে যে শ্রীযাদব ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আঘাত করেছেন। কিন্তু কাউকে বোঝানো যায়নি যে, প্রার্থনা মুসলমানদের সাংবিধানিক অধিকার হতে পারে কিন্তু তার জন্য প্রতি শুক্রবার বিশেষ ছুটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না। যোগেন্দ্র যাদবের এই অভিজ্ঞতা একটা বিষয়কে স্পষ্ট করে দেয়, ধর্মনিরপেক্ষতার চাদর গায়ে দিয়ে বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন আসলে সংবিধানকেই আহত করা। এমনকী তা সাংবিধানিক কর্তব্যকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

আসল সমস্যাটা হলো, আমাদের দেশ ভারতবর্ষে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সাংবিধানিক দায়ের চেয়ে ভোটের অঙ্ক ভারী করার দায়কেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা হয়ে ওঠে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা এবং তার

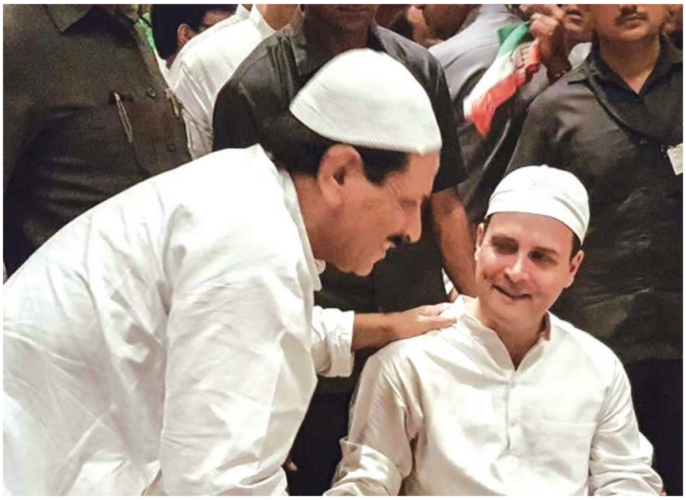

ফল ভুগতে হয় দেশের সংখ্যাগুরু সমাজকেই। কারণ ওইসব রাজনৈতিক শক্তির কাছে ভোটের বাক্স ভারী করার জন্য প্রয়োজন মুসলমানদেরই। তাদের দুর্বলতাকে ওই রাজনৈতিক শক্তিধররা পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে।

আমরা সকলেই জানি, ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার সময় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রাধান্য পায়নি। শব্দটি প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করার দাবিটা রেখেছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, সমাজবাদী এবং ভারতীয় সংবিধান রচনার দায়িত্বে

নিযুক্ত কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অব ইন্ডিয়ার সদস্য কে টি শাহ। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত বিতর্কের পর গণপরিষদ শব্দটিকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মত দিয়েছিল। এই কারণে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি মানানসই ছিল ইউরোপের আর্থ-সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। গণপরিষদের বক্তব্য ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা হলো পোপশাসিত দিব্যতান্ত্রিক দেশগুলিতে ১০০ বছরের পুরনো প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া।'

শব্দটি নতুন করে ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত হয় ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী জমানায়। উল্লেখ্য, ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তাঁর পছন্দমতো শাসনব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে। সে সময় বিরোধী নেতাদের জেলবন্দি করা হয়েছিল অথবা কেউ কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলত প্রায় ফাঁকা সংসদে সরকারপক্ষ 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির চাদর চড়িয়েছিল ভারতীয় সংবিধানের ওপর। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভিত্তিসম্পন্ন এক ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক জীবন যাপনের ধারণাকে অস্বীকার করে সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি কায়েম করা।

পরবর্তীকালে ঠিক সেটাই হয়েছে এবং গোটা দেশ জুড়ে অনৈতিক রাজনীতির অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সীমাহীন সংখ্যালঘু তোষণ। যার অন্য অর্থ সাধারণভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকারকে অস্বীকার করা, বাধা দেওয়া এবং গোটা জাতিকে শতধা বিভক্ত করে গোটা সমাজটাকে বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন ও অসুস্থ করে তোলা। এমনকী যে দলগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের কথা বলে সেইসব বামপন্থী দলগুলিও পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কথা বলে মূলত যে ধর্মনিরপেক্ষতার উদারতা প্রদর্শন করে তাও তোষণেরই নামান্তর।

শুধু রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আঁচল ধরা বুদ্ধিজীবীরাও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে বর্ম বানিয়ে ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের চূড়ান্ত নজির রেখেছেন বহুবার। এরকম ঘটনা মনে রাখার মতো উদাহরণ হলো এই কলকাতার বুকে শুধুমাত্র বিজেপির বিরোধিতা করতে হবে বলে বামপন্থী নেতারা এবং রাজ্যের শাসকদলের বেশ কিছু হিন্দু বুদ্ধিজীবী গোমাংস খেয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন— তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ।

কী অস্বাভাবিক মূর্খামি। যেন গোমাংস খাওয়াটা ধর্মনিরেপেক্ষতা প্রমাণ করার একটা ব্র্যান্ড আইকন। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা তো শুয়োরের মাংস খেতে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণের নজির রাখলেন না। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সে দাবিও করেননি। সম্ভবত ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণের জন্য সেটার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি তাঁরা। আসল কারণ তাঁরা নিজেরাও জানেন, যে তাঁরা কেউই ধর্মনিরপেক্ষ নন। কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোমাংস ভক্ষণ করেছিলেন শুধুমাত্র বাজার গরম করে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে সস্তা দেখনদারি রাজনীতির ঠিকাদারি করতে।

এই সব বুদ্ধিজীবীকেও ছাপিয়ে গেলেন শিক্ষাব্রতী সরকারি কর্মচারীরা। এ বছর অপরীক্ষিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে গিয়ে অতি উৎসাহী এবং অতি অনুপ্রাণিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভানেত্রী মহুয়া দাস ঘোষণা করলেন, '৫০০-র মধ্যে এককভাবে ৪৯৯ পেয়ে এবারে মাধ্যমিকে প্রথম হলো এক মুসলিম কন্যা। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে এক মুসলিম লেডি...গার্ল...। নাম রুমানা সুলতানা।' ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য এই ঘোষণা কী সত্যিই খুব জরুরি ছিল? যদি তাই হয় তাহলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্থানে যেসব হিন্দু ছেলে-মেয়েরা রয়েছে তাদের নাম কেন ঘোষণা করা হলো না? কেন বলা হলো না— এবারে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী পাশ করেছেন...জন। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী পাশ করেছেন... জন।

দুঃখজনক হলেও চরম সত্য হলো এটাই— ভরতবর্ষে যে বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্য এবং ঐক্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে শিরোধার্য করে গোটা দেশ ও দেশের জনগণকে এক সুত্রে এতকাল বেঁধে রেখেছিল, 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির মাহাত্ম্যে সেই সূত্রটাই হারিয়ে ফেললেন তোষণবাদী রাজনীতিকরা। হারিয়ে দিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতকে যেখানে আজও সুরে সুরে ঢেউ খেলে শব্দযুথ— 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ/ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।' হারিয়ে দিলেন সেই সবার নমস্য কবি কাজী নজরুলকেও যিনি লিখেছেন— 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।'

প্রশ্ন হলো, ধর্মনিরপেক্ষতা যদি সাংবিধানিক নীতি হয়, ধর্মের অধিকার যদি সাংবিধানিক অধিকার হয়, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা সাংবিধানিক কর্তব্য হবে না কেন? অর্থাৎ মুসলমান তোষণ যদি ধর্মনিরপেক্ষতা হয়, হিন্দুতোষণ ধর্মনিরপেক্ষতা হবে না কেন?

মুশকিল হলো, লজিকের ভাষায় কথা বলা যাবে না। কারণ লজিক মানলে ভোটবাক্স ভরবে না, বিশেষ করে রাজ্যে রাজ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আঞ্চলিক দলগুলির এবং ছোটো হতে হতে ক্রমশ মাইক্রোস্কোপিক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-এর মতো দলগুলিরও। তাই যদি বলা হয়, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির অন্তর্ভুক্তিকরণ আসলে ভারতবাসীর সঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান— সবার সঙ্গে প্রতারণারই নামান্তর।

একটা বিষয় লক্ষণীয়, ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করেই গণপরিষদ সংবিধান রচনার সময় সচেতন ভাবেই শব্দটিকে বাদ দিয়েছিল। কারণ বহুত্ববাদ যে ভারতবর্ষে কালাতিকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গটাই বাহুল্যমাত্র। আজও ভারতের সেই বহুত্ববাদ বিলীন হয়ে যায়নি। তবুও গায়ের জোরেই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির অনুপ্রবেশ ঘটল শব্দটির কোনও সাংবিধানিক সংজ্ঞা অথবা ব্যাখ্যা নির্ণয় না করেই। বৈদেশিক ধারণাকে জোর করে ভারতবাসীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি করার এই অপচেষ্টার সঙ্গে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজও তাই উত্তর দিনাজপুরের একটি সীমান্ত গ্রামের একটি স্কুলে উর্দুভাষী ছাত্র না থাকলেও উর্দু শিক্ষককে নিয়োগ করা হয় সরকারি তত্ত্বাবধানে। প্রতিবাদ করতে গেলে গুলিতে মৃত্যু হয় দুই হিন্দু কিশোরের। এরা কি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না? আজও পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত লাগোয়া জেলা মুর্শিদাবাদ, মালদার বহু স্কুলে সরস্বতী পুজো হতে দেওয়া হয় না। কারণ ওইসব এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যার প্রাধান্য। আজও তাই কোনো মুসলমান ধর্ষক কোনও কিশোরীর নারীত্বের মর্যাদা হরণ করলে বুদ্ধিজীবীরা এবং সংবাদমাধ্যমগুলি সোচ্চার হয় না। কিন্তু যদি কোনও হিন্দু ধর্ষক কোনো নারীর নারীত্ব লুট করে তাহলে গোটা দেশে মোমবাতি বিক্রি হয়ে যায় টন টন। মাঝে মাঝে মনে হয়— এই সব বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে কি তাহলে যোগসাজস থাকে মোমবাতি তৈরির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির?

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা ড. মনমোহন বৈদ্য তাঁর একটি রচনায় প্রশ্ন তুলেছেন— সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ অধিকার যে দেয়নি, তা তো নয়। বরং সেসব অধিকার থেকে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা বঞ্চিত হয়েছে। এর পরও সংবিধানে ১৯৭৬ সালে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি যুক্ত করার অর্থ কী? আর যদি ভারত প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়ে থাকে, তাহলে কি কোনো কারণে হজ-ভরতুকি দেয় কেন্দ্রীয় সরকার? অন্য কোনো ইসলামীয় দেশ তো হজ-ভরতুকি দেয় না! তাহলে কি এটাই সত্য যে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের খাতিরেই?

হিসেব করলে দেখা যাবে— ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলি মুসলমানদের যে পরিমাণ সাহায্য ও দান খয়রাতি করে থাকে, সে তুলনায় খ্রিস্টান বা বৌদ্ধরা সেইসব সাহায্য ও দান-খয়রাতি পান না। যদিও তাঁরাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অথচ কর্তব্য পরায়ণতার নজিরে আজও সবচেয়ে পিছিয়ে ওই মুসলমান সমাজই। এমনকী ওই মুসলমান সমাজ পিছিয়ে উন্নয়নের নজিরেও। কারণ এরা বুঝে গেছেন— দেশের আইন মুসলমানদের ক্ষেত্রে ততোটা প্রয়োগ করা হয় না, যতটা প্রয়োগ করা হয় হিন্দুসমাজের ওপর। অতএব পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে সরকার ও সরকারি প্রধান মুসলমানদের ‘দুধেল গাই’ হিসেবে মন্তব্য করে বলেন, ‘দুধেল গাইয়ের লাথিও খেতে হয়’ সেই পশ্চিমবঙ্গে সারা বছর ধরে যত অপরাধ ঘটে তার সিংহভাগের অপরাধীরা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্তত ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর থেকে তো রাজ্য সরকার অপরাধ তালিকাভুক্ত করা বা অপরাধের বিস্তারিত রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ তালিকা তৈরি হলে প্রমাণ হয়ে যাবে— এরাজ্যে মুসলমান তোষণ যত বেশি, মুসলমান অপরাধীর সংখ্যাও ততটাই বেশি। একটা ভারসাম্য থেকেই যায় দুটি অপরাধের মধ্যে। যে ভারসাম্যটা রক্ষিত হয় না সেটা হলো— ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

কানাডার পাকিস্তানি সাংবাদিক তারেক ফতেহ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন— India is the only major civilizational country where you are systematically tought to hate your heritage and glorify the invaders who came to destroy it. And this (absurdly) is called 'Secularism'.

> **রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ হয়, তাহলে ব্যক্তিকে আলাদা করে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাজ বুকে ঝোলাতে হয় না। ঝোলাতে হয় তোষণকারীদের।**

তথাকথিত মুখোশধারী মুসলমান তোষণকারী ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মুখে এতবড়ো থাপ্পড় এর আগে কোনো মুসলমান ব্যক্তিত্ব মেরেছেন কিনা, জানা নেই। কিন্তু তারেক ফতেহ-র এই মন্তব্য প্রমাণ করে দিয়েছে, যতদিন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য আইনি বিভেদ থাকবে ততদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘু ধর্মীয় মৌলবাদ বহাল থাকবে আর ততই ম্রিয়মাণ হবে ভারতের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এবং সংখ্যাগুরুদেরও পরিচালিত করা হবে ভুল পথে। শেখানো হবে— ধর্মনিরপেক্ষতা হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়া এবং হিন্দুদের অপরাধকে তীব্র ধিক্কার জানানো। ওরা মন্দির ভাঙলে চুপ করে থাকো। আমরা সেই কলঙ্ক হটালে দেশজুড়ে বিক্ষোভ কর। যেমনটা হয়েছে অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর। কোনো ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শক্তিকে বলতে শোনা যায়নি— কাশীর মন্দির উদ্ধার হবে না কেন? মথুরার কৃষ্ণমন্দির উদ্ধার হবে না কেন? কেন বাধা দেওয়া হবে তাজমহলের রহস্য উদঘাটনে?

ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার বাহাত্তর বছরে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির সংজ্ঞায়ন ও ব্যাখ্যা নতুন করে করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাই আজ বিপদ্‌গ্রস্ত। ধর্মের অন্ধ সমর্থন এবং ধর্মের অন্ধ বিরোধিতা— দুটিই ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি প্রয়োগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মানুষ ধর্মীয় রাজনৈতিক ছলনায় অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে বিভাজন করতে ভুল করে ফেলে। বুঝতে পারে না, অধিকার প্রয়োগ করতে হলে কর্তব্য পালনও একইভাবে জরুরি। ভারতবর্ষকে ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন এটা বুঝে নেওয়া যে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল নির্যাস হলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় মতের সমতা রক্ষা করা। যা রামকৃষ্ণ বলতেন— ‘যত মত তত পথ’। কিন্তু কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। সেটাই হলো হিন্দুত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ তাই ভারতবর্ষকে ‘সকল ধর্মের মা’ হিসেবে উল্লেখ করে গেছেন। কারণ ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে দেশ তার প্রাচীনতম জীবনধারা হিন্দুত্বকে মর্যাদার জায়গায় রেখেও অন্যান্য দেশ থেকে বিতাড়িত ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত মানুষকে আশ্রয় দিতে দ্বিধা করেনি। সেই হিসেবে হিন্দুরাই তো প্রধানতম ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ।

আজ যারা রাজনীতির চক্রান্তের স্ক্রিপ্ট রচনা করে ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন অর্থ প্রতিষ্ঠার অবিরাম চেষ্টা করে চলেছেন, তাঁদের উচিত— ভোটের কথা না ভেবে আগে দেশের কথা ভাবা। অধিকার আর কর্তব্য— দুটোকে গুলিয়ে না দেওয়া। আর মুসলমানদের ভিখারি বানিয়ে তাদের, মৃত্যুমুখে ঠেলে না দিয়ে তাদের শিক্ষিত করে তোলা।

‘ধর্মনিরপেক্ষ’ মানুষগুলো একথা বোঝেন না তা নয়। কিন্তু এও বোঝেন— এসব বলে কী লাভ! আমরা হলাম ভোট-ভিখরি। তোমাদের জ্ঞানদর্শন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করতে পারবে না।

না, পারবে না। ঠিকই তো। পারবে না। কারণ ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষ মানুষগুলো বিশ্বাস আর সত্তার তফাত করতে পারেন না। তাঁরা জানেন না— হিন্দু-মুসলমানের সত্তা একটাই। তারা ভারতীয়। বিশ্বাস আলাদা আলাদা। সেটা হলো ধর্ম। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষরা এই দুটিকেই সমান গুরুত্ব দেন। সেখানে তোষণ শব্দটা অপাংক্তেয় হয়ে ওঠে। কারণ তাঁরা জানেন— রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ হয়, তাহলে ব্যক্তিকে আলাদা করে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাজ বুকে ঝোলাতে হয় না। ঝোলাতে হয় তোষণকারীদের। ◻

দীপ্তাস্য যশ

শুধু অধিকার নয়, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধও প্রয়োজন

পূর্ব বর্ধমানে আমাদের বনবাসী অধ্যুষিত গ্রামে ছোটোবেলা থেকেই সন্ধ্যের খুব পরিচিত দৃশ্য ছিল সন্ধ্যে নামলেই পাড়ায় মাদল বেজে উঠত আর তার সঙ্গে শুরু হতো এক অদ্ভুত মন উদাস করা সুরের গান। শান্ত, নিস্তরঙ্গ আমাদের গ্রামে সেই সময়ে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। ফলে সূর্য ডোবা মানেই মাঝবয়সি বা অল্প বয়সিদের আড্ডা বসত কোনো বাড়িতে। আর একটু বয়স্করা বসতেন তাস বা দাবা নিয়ে। সেই আড্ডার আসরগুলিতে যেমন গ্রাম সম্পর্কিত সব সংবাদের আদান প্রদান হতো, তেমনই নানা উদ্যোগেরও এই আড্ডাগুলি থেকেই সূচনা হতো। নানাবিধ উদ্যোগ ছিল এর মধ্যে। গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রচেষ্টা থেকে, লাইব্রেরি স্থাপন কিংবা গ্রামের প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার। আবার গ্রামের রাস্তা প্রতি বছর বর্ষায় কাদায় ডুবে যাচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত সদস্যকে ডেকে তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা। আবার পুজোর সময় যাত্রার আয়োজন কিংবা গ্রামে ২৫শে বৈশাখ আয়োজন সেই উদ্যোগের শুরুও এই সান্ধ্য আড্ডা থেকেই হতো। এইরকম নানাবিধ কর্মকাণ্ড গ্রামের এই সান্ধ্যকালীন আড্ডাগুলিতে দেখা যেত। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এর মধ্যে যেমন নাগরিক অধিকারের দাবি ছিল, তেমনই নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতাও ছিল, আবার সামাজিক দায়িত্বও ছিল। অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য তিন সম্বন্ধেই সচেতনতা ছিল। অবশ্য এ যে সময়ের কথা বলছি তখন আশির দশকের শেষ দিকে। তখনও সমাজ সেভাবে পার্টির লোকাল কমিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

মোটামুটি ভাবে ৮০-র দশক পর্যন্ত গ্রামে একটা মধ্যবিত্ত বা ধনী সমাজ ছিল। তাদের গ্রামে প্রভাব ও সম্মান দুই-ই ছিল। বহুলাংশে গ্রামীণ জীবন তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। সদ্য সিগারেট খেতে শেখা যুবক তখনও নিজের পরিচিত এলাকায় যেখানে সেখানে সিগারেট ধরাতে সাহস পেত না। তখনও গ্রামীণ সমাজকে রাজনৈতিক দল সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেনি। এই মধ্যবিত্ত বা ধনী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হতো। তবে নব্বই দশকের মোটামুটি শুরুর দিক থেকেই এই মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায় গ্রাম ছাড়তে শুরু করে আর গ্রামীণ জীবনও আস্তে আস্তে রাজনীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। দুটি কারণে এই পরিবর্তন মূলত ঘটেছিল। এক, ভূমিসংস্কার বা অপারেশান বর্গা। দুই, সম্পূর্ণভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক উন্নয়ন ও অর্থনীতি। বামেরা ভূমিসংস্কার বা অপারেশান বর্গাকে তাদের সাফল্য বলে তুলে ধরে আজও। কিন্তু আদতে তা একটি অসম্পূর্ণ প্রকল্প। এর ফলে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ তো হয়েছিল, কিন্তু তার সুবিধা প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। মধ্যবিত্ত বা ধনী সম্প্রদায় চাষে বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়, কিন্তু তার পরিবর্তে সরকার আধুনিক কৃষি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি। যেহেতু এই লেখার বিষয়বস্তু অন্য তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যাব না, খালি অনুরোধ করব পশ্চিমবঙ্গের ঠিক কতো মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন, প্রান্তিক চাষির সংখ্যা কতো, পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে গ্রামগুলি থেকে অল্পবয়সি কত ছেলে-মেয়ে অন্য রাজ্যে কাজে যায় সেই হিসেবগুলি একবার দেখে নিতে। তবে নাগরিক কর্তব্যের দিকটি কেন আজ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে এতো অবহেলিত তার মূল কারণ এটিই। কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি আজ ক্ষয়িষ্ণু।

অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা এবং বিকল্প জীবিকার অভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি আজ পুরোপুরি ভাবে পঞ্চায়েত নির্ভর মূলত বিভিন্ন সরকারি ভাতা প্রকল্পের কারণে। একশো দিনের কাজ হোক বা কন্যাশ্রীর ভাতা বা বিধবা/বার্ধক্য ভাতা পেতে মানুষ পুরোপুরি ভাবেই পঞ্চায়েতের উপরে নির্ভরশীল। আর এই ভাতাগুলি তার কাছে প্রয়োজনীয় আর্থিক অসঙ্গতির কারণে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিবার এত হানাহানির কারণও এটিই। কিন্তু এসবের মধ্যে পড়ে মানুষ তার নাগরিক কর্তব্য এবং নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে বোধই আজ হারিয়ে ফেলেছে বা সেই বোধ তার থাকলেও মুখ ফুটে বলার সাহস নেই। যা

পরোক্ষে তাকে প্রভাবিত করেছে নিজের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও অবহেলা করতে। রাজনীতির স্বার্থে আজ বিভিন্ন ভাতাকে মানুষের অধিকার বলা হচ্ছে। কিন্তু সরকারের থেকে ভাতা পাওয়াই কি মানুষের একমাত্র রাজনৈতিক অধিকার? কর্মের অধিকার, উন্নত জীবনের অধিকার, উন্নত বাসস্থানের অধিকার, এগুলির কি কোনো গুরুত্ব নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের আমলে আর বাম সরকারের আমলে এই বিষয়গুলির কোনো সুরাহাই হয়নি। তাই সরকার সদা সচেষ্ট বিভিন্ন ভাতার মাধ্যমে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে।

বিভিন্ন ভাতা বা বাড়ি তৈরিতে সহায়তা কিংবা খাদ্যের অধিকার বা শিক্ষার অধিকার অবশ্যই নাগরিক অধিকার। সেই সঙ্গে কর্মের অধিকার, জীবনযাত্রার উন্নয়নও আমাদের অধিকার। আর সেই অধিকার লাভের ক্ষেত্রে জরুরি আমাদের নাগরিক কর্তব্য।

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ঘিরে এই যে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি এ নিয়ে আমাদের নীরবতাও আমাদের নাগরিক কর্তব্যের প্রতি অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রকট করে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যেমন আমাদের অধিকার, তেমনিই সেই প্রকল্পগুলিতে নানাবিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের নাগরিক কর্তব্য। কারণ আমরা যে সরকারি সহায়তা পাচ্ছি সেই সহায়তা কোনো না কোনো ভাবে আমাদের নাগরিকদেরই অবদান। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সরকার যে কর আদায় করে সেই করের টাকাই জনগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। ফলে সেই সম্পদের রক্ষা আমাদের প্রত্যেকের নাগরিক কর্তব্য।

যেমন ধরুন আবাস যোজনা। পশ্চিমবঙ্গে এখন খুবই সাধারণ বিষয় আবাস যোজনার টাকা পেতে হলে ১৫-২০ হাজার টাকা শাসক দলকে সেলামি দিতে হবে। আমরা যদি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব না হই তাহলে আমরা নাগরিক কর্তব্যকে অবহেলা করছি, পরোক্ষে আমাদের নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি। নাগরিক কর্তব্য এবং অধিকারের আরও একটি দিকের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়।

কয়েকদিন আগে আমার এক উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কিছু আলোচনা হচ্ছিল। বন্ধুটি অবলীলায় বললেন, এরকম তো প্রতি ভোটেই হয়। এই যে অনুভূতিহীনতা এটিই হলো নাগরিক কর্তব্যের অভাব। আমি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেও পারি, নাও পারি। আমি কোনো নির্দিষ্ট দলের সমর্থক হতেও পারি, আবার নাও হতে পারি। কিন্তু আমার চারিপাশে যাতে গণতান্ত্রিক পরিসর বজায় থাকে, মানুষের জীবনযাত্রা যাতে পুরোপুরি রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা এবং আমার প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজ নিজ রাজনৈতিক বোধ অনুযায়ী নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেই অধিকার সুনিশ্চিত করা আমার নাগরিক কর্তব্য। এক্ষেত্রে আমি যদি আমার নাগরিক কর্তব্যে আজ অবহেলা করি তাহলে আগামী দিনে আমার নিজেরও নাগরিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যের প্রতি এই অবহেলার দরুনই আজ গ্রামের সামাজিক পরিকাঠামোও ভেঙে পড়ছে। আগে গ্রামে যে বিশেষ দিনগুলিকে ঘিরে সাংস্কৃতিক চর্চা হতো, খেলাধুলার চর্চা হতো সেসব আজ বন্ধ। বরং সরকার তাতে আরও মদত দিচ্ছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সরকারি উদ্যোগে সস্তায় মদ বিক্রি। আসলে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে যদি আমরা সচেতন না থাকি, তাহলে সরকারের সুবিধা হয় আমাদের অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে। সেই কারণেই সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙেচুরে দেওয়ার জন্য এতো প্রচেষ্টা। আচ্ছা ভাবুন তো, এই কয়েক বছর আগেও পাড়ার ক্লাব মানে আমরা কী বুঝতাম? খেলাধুলার চর্চা, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ, সাংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদি। আজ কী বুঝি? আজ ক্লাব মানেই শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে দু' লক্ষ টাকার অনুদান পাওয়া। এতে করে হয়তো কিছু রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা গেল। কিন্তু সামাজিক যে পরিকাঠামো তা ভেঙে গেল। ফলত আজ যদি আমার পাড়ায় রাস্তা না হয় কিংবা অন্য কোনো নাগরিক পরিষেবার বিঘ্ন ঘটে তাহলে প্রতিবাদ করার কোনো মঞ্চ নেই। অর্থাৎ আমার নাগরিক অধিকারও সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আর আমরা এইসব দেখেও চুপ এবং মনে করছি এসবই স্বাভাবিক। আমার নাগরিক কর্তব্যের প্রতি অবহেলার কারণেই আজ আমার নাগরিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত।

নির্বাচনী ক্ষেত্রে বিশেষত এই রাজ্যে 'পাইয়ে দেওয়ার' রাজনীতিকে নাগরিক অধিকারের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়ার সবসময়েই একটা প্রচেষ্টা চলে। সেই পরিস্থিতির সমাধানের একটাই উপায় মানুষকে তার নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা। আমরা যদি আমাদের নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকি তবেই আমাদের নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আবার একথাও বলা জরুরি যে সরকারের সমালোচনা করা আমার নাগরিক অধিকার, কিন্তু সরকারের সমালোচনা আর দেশের বিরোধিতা যাতে একই না হয়ে যায় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা আমার নাগরিক কর্তব্য। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সবসময়েই একে অপরের পরিপূরক। তাই ভূমিসংস্কার যেমন আমার অধিকার, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাও আমার অধিকার। একই ভাবে বিকল্প জীবিকার বন্দোবস্তও আমার নাগরিক অধিকার। আর এই অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, তাই দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং সর্বোপরি সুবিধাভোগী দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখা আমার নাগরিক কর্তব্য।

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা : ভরতুকিজীবী না বানিয়ে কর্তব্য-পরায়ণ নাগরিক চাই

কল্যাণ গৌতম

দায়িত্বজ্ঞানহীন বিদেশিশক্তি কখনও অনুকূল অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে দেশবাসীর হাতে প্রত্যার্পণ করে না, ঠ্যালায় পড়েই করে। সমবেত চেষ্টায় দেশকে উপযোগী করে গড়ে নিতে হয়। 'গড়ে নেবার বেলায়' শরণার্থীর নরক যন্ত্রণার মাঝে যারা ধ্বংসাত্মক উগ্র রাজনীতির আয়োজন দেখেন, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক ঢাল করেন, তারা আর যাইহোক, দেশ গড়তে চান না, কেবল 'ইজম' গড়তে অসেন; মানুষকে ভরতুকিজীবী বানাতে বসেন। আপৎকালীন সময়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার ভরতুকি আর চিরকাল ভোটব্যাঙ্ক বানিয়ে তোলার ভরতুকির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ভরতুকি-বান্ধব রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্রবন্ধু কী না দু'বার ভাবতে হবে।

'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে আমরা দেশ গঠনে অবহেলা দেখাতে পারি না। সত্য-সম্পর্কে, কর্তব্যে দেশ গঠনে শামিল হতে হবে। বুভুক্ষু মানুষের ফাইল চিত্র স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পার্টির সংবাদপত্রে তুলে ধরলে এবং 'বিশ্বনাগরিক' হয়ে সন্ত্রাসী-অনুপ্রবেশকারীর পরিত্রাতা হয়ে কথা বললে, 'দেশ নামক ফুটো কলসি'-টি উন্নয়নের জলে পূর্ণ হবে না। 'আগে দিয়ে বেড়া/তবে ধরো গাছের গোড়া'— এটিই দেশ-মালঞ্চের মূলমন্ত্র। দেশের মাটি থেকে 'আগাছা' যেমন সরাতে হবে, তেমন দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণেও শামিল হতে হবে। ভরতুকির বদলে এমন বৃহৎ পরিকাঠামো চাই যা গরিব-বান্ধব বলে বিবেচিত। উপলব্ধিতে সেটাই Felt এবং unfelt need।

স্বাধীনতা-হীনতায় আমরা কেউ-ই স্বচ্ছন্দ বোধ করি না, ভালোও থাকি না। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/কে বাঁচিতে চায়?/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,/কে পরিবে পায়।' বিদেশি শাসনে থাকে শোষণ, দ্বিচারিতা, বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা। তা পাঠান-মোগলের শাসনই হোক, অথবা ব্রিটিশ-ইংরেজ। স্বাধীনতা- হীনতাকে নরকের সমতুল্য বলেছেন রঙ্গলাল। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'মনে রাখিস ইংরেজরাই এদেশের সর্বনাশ করছে।' স্বামীজীর কণ্ঠেও শোনা যায়, 'তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা।'

বাইরের একটা শক্তি যে আমাদের ওপর চেপে বসেছিল, তার কারণ দেশের মধ্যেই ছিল একটা অবিরল অনৈক্য। 'ভারতীয় জাতি' বলে তখন কিছু দানা বাঁধেনি। হতাশ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে লিখতে হয়

> মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বৌদ্ধিক জগতের স্বাধীনতা, অন্তরাত্মার স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধ তার চেয়েও জরুরি, ওখানেই যত কুমির হাঙ্গরের দল লুকিয়ে আছে।

'A nation is making'; যার মোদ্দা কথা হলো জাতি তৈরি নয়, জাতি তৈরি হচ্ছে। এমন জাতি কীভাবে স্বরাজ অর্জন করবে? স্বামীজী বলছেন— স্বাধীনতা, সে তো কালই আসতে পারে, কিন্তু দেশবাসী কি তার জন্য প্রস্তুত? প্রায় একই কথা রবীন্দ্রনাথও বলছেন, 'স্বদেশকে ভেতর থেকে তৈরি করে তোলবার সাধনা চাই।' 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে দিয়ে বলাচ্ছেন, 'ভেতর পাকানোর ব্যবস্থাই হয়নি শুধুই বাইরে থেকে প্রলেপ চাপানো।' নেতাজী বলেছিলেন, রাজনৈতিক স্বরাজ নয়, চাই স্বদেশী স্বরাজ, তা না হলে ভারতবর্ষ ইউরোপীয় চিন্তার লীলাভূমিতে পরিণত হবে।

এখন জাতি গঠন কীভাবে হবে? পথ বাতলেছেন স্বামীজী, 'তোমাদের মধ্যে মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরি কর। তারপর স্বাধীনতার কথা ভাব।' তার মানে সেবক তৈরি না করে স্বাধীনতার কথা ভাবা উচিত নয়। বলেছেন, 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ঘুমাইলে কোনো ক্ষতি নাই।' আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সমস্ত মনীষী ভেতর থেকে ভারতবাসীকে শক্তি জোগাচ্ছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখছেন, 'তুমি যদি নিজেকে বলবান ভাবো, ওটা কল্পনা, ভারতেরও বল আছে... এইটি প্রথম বোঝা।' একই বক্তব্যে রবি ঠাকুর গান বাঁধলেন : 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান/তুমি কি এমনি শক্তিমান?' লিখলেন, 'শাসনে নেরে/বোঝা তোর ভারী হলে ডুববে তরি খান।'

ব্রিটিশ শাসনে দেশবাসী বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিল— সাদা চামড়া ও কালো চামড়া। তারও আগে মোগল আমলে ধর্মীয় বৈষম্য প্রবল ছিল। তাই রামমোহনের যুগ থেকে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে

প্রকটিত হলো ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ঘটনাচক্রে তা ছিল হিন্দু-জাতীয়তাবাদ। ঊনিশ শতকে মননে, আকাঙ্ক্ষায়, চিন্তায় এল মস্ত বড়ো চৌম্বক ঢেউ। সমাজের মধ্যে উত্তাল হলো তার প্রবাহ, তার গতি। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেল বিশ শতকে গিয়ে; তা গেল জাগরণ ও বিস্ফোরণের পর্যায়ে। তারপর এলো অগ্নিময় অধ্যায়। অহিংস-সহিংস-আধ্যাত্মিক-বৌদ্ধিক নানান ধারায় তা পরিপুষ্ট লাভ করল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডাক দিলেন, বিজ্ঞানের কাজ থেমে থাকতে পারে, কিন্তু স্বরাজের কাজ নয়।

ইতিহাস শিক্ষা দেয় সত্যের কুসুমকলি সংগ্রহ করতে। কিন্তু ইতিহাসবিদের মধ্যেও যে 'ভুয়ো' মানুষ রয়েছেন অজস্র এবং তাদের 'মেন্টর'। তারা মনগড়া ইতিহাস লেখেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এইভাবে নানান মতাদর্শের ঐতিহাসিক স্পর্শে বহুধা খণ্ডিত হলো। তবুও বানানো ইতিহাসের মধ্যে আমরা খোঁজ পেয়ে গেছি আসল ইতিহাসের রূপ। সে বিতর্কে না গিয়ে আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে আমরা সমস্ত মুক্তি-সন্ধানী বীরযোদ্ধাদের যথাযোগ্য স্মরণ করতে চাই। কিন্তু যে কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হলো— রাজনৈতিক বন্ধন থেকে কেবল মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বন্ধনমুক্তি ছাড়া অখণ্ড স্বাধীনতার স্বাদ সম্ভব নয়। সে কাজ ইদানীং শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে বলেই ভুয়ো দেশপ্রেমিকরা গর্ত থেকে বেরিয়ে বিরোধিতার রাস্তায় যাচ্ছেন। যারা মনে করেন, দেশপ্রেম হচ্ছে অতি জাতীয়তাবাদ ও একটি বিষাক্ত মানসিকতা— তাদের সঙ্গে একমত হওয়া চলে না।

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে ভাবনাচিন্তার রসদ আছে বৈদান্তিক ভারতবর্ষে। সমগ্র পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে মানব সম্পদের সাধারণ তহবিল-— একথা ভারতবর্ষই বলে এসেছে, এরজন্য পাশ্চাত্যের 'ইজম' দরকার নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে আছে উন্নয়নের উপযুক্ত পুষ্টি, বিকাশের অজস্র সূত্র। অন্ধ ভিখারি সেজে যারা তা না দেখতে চান, তাদের হেড কোয়ার্টার ভারতবর্ষ অন্তত নয়।

ভারতবর্ষে এখন যেটা প্রয়োজন, তা হলো ভেতরের পাপ সরানো— দেশের মধ্যে লালিত দীর্ঘদিনের পাপ, ভ্রান্ত ইতিহাসের পাপ, ভারত বিরোধী মানুষের যাবতীয় মনের পাপ; তাদের অকৃপণ বীভৎসতার পাপ। সন্ত্রাসবাদ আমরা চাই না, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চাই না, আবার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলে চালানো মায়াবাদও চাই না। যে রাজ্যে একটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দলের হাতে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থক খুন হয়ে যান, সে রাজ্য কি আদৌ স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত? যে রাজ্যে প্রতি পদে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধী দল গণতান্ত্রিক অধিকার হারায়, সে রাজ্য কি স্বাধীন দেশের অন্তর্ভুক্ত? যে রাজ্যে দেশ-বিরোধিতার শিকড় বহুদূর বিস্তৃত, অথচ সে টুঁ-শব্দটি নেই বুদ্ধিজীবীদের, সে কি ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত? সর্বকথায় কেন্দ্রের বিরোধিতা করা, অখণ্ডতা-বিরোধীদের শক্তিমান করার খেলা ভারতবর্ষেই হয়। তাই হিন্দু নিধনযজ্ঞের দিন 'খেলা হবে দিবস' পালিত হয় এই ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গরাজ্যে। তাদের কথার জাগলারিতে না ভোলাই ভালো। তারা অধিকারের নামে মানুষ খেপাতে চান। সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে 'ইজম'-এর আন্তর্জাতিকতা চান। ইজম- পসন্দের আগ্রাসনে ভারতবর্ষের মাটিতে জেহাদ নামিয়ে আনাটাই তাদের মূল লক্ষ্য। কথার শব্দজব্দে, ইজমের বাক্সে ভারতের স্বাধীনতাকে বন্দি করতে চান তারা।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ একটি ভরতুকিময় রাজ্যে পর্যবসিত। যুবসমাজের সামনে পরিকল্পনা নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, ভারীশিল্প নেই, চাকরি নেই। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ, নারী, ছাত্র-ছাত্রী, সংখ্যালঘু-সহ আপামর রাজ্যবাসীকে ভুলিয়ে রাখতে নানা প্রকল্প তৈরি করে হাতে-গরম যৎসামান্য টাকা তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এটা কর্মক্ষমতা বিলোপ করার ভয়ংকর ভরতুকি। যুবশক্তিকে অলস ও অপাংক্তেয় করে রাখার পঙ্কিল-প্রবণতা। একটি ঋণগ্রস্ত রাজ্য অকারণ ভরতুকি ভরিয়ে আরও ঋণের বোঝা মানুষের কাঁধে চাপাতে চায়। সুদের টাকা জোগাতেও ঋণ করতে হয়। সে রাজ্য ক্লাবে ক্লাবে অলস মস্তিষ্ক তৈরির জন্য টাকা ঢালবে কেন?

যে রাজ্যের শাসকদল বুঝেছে কর্মসংস্থানের আন্দোলন যখন দানা বাঁধবে, সামনে খান কয়েক নোট ছিটিয়ে দিলেই নেশাগ্রস্ত মানুষ ফের বুঁদ হয়ে থাকবে, সে রাজ্যের ভবিষ্যৎ নেই। ভরতুকি পাওয়ার অধিকারেই যে রাজ্যে নির্বাচন সংঘটিত হয়, সে রাজ্য এগোয় না। এই অকর্মণ্য-অধিকার মানুষকে নিকৃষ্টতর করে, আত্মবিশ্বাস দূর করে, মানসিক-পঙ্গু করে, কর্মক্ষমতা বিলোপ করে। ভরতুকির অধিকার- আদায়ে অভ্যস্ত না হয়ে, দেশ ও জাতির প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন রাজ্যবাসী কীভাবে করবে, তার কোনো দিশা এ রাজ্য দেখাতে পারেনি। তাই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাজ্যবাসী দু'আনা-প্রাপ্তি বিনা কর্তব্যের পারিতোষিক বলে মনে করেছে। পরিষেবা না দিয়েই প্রাপ্তি আর যাইহোক, দেশকে সামনে এগোতে দেয় না।

বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা বজায় রেখে গড়তে হয় মানবিক সম্পদ। ভারতমাতার কাছে প্রার্থনা চাই, 'মানুষ' হয়ে গড়ে ওঠার, 'ভারতবাসী' হয়ে গড়ে ওঠার। ভারতের খেয়ে-পরে ভারতকে ভাঙার খেলায় যারা মেতে উঠেছেন, তাদের সঙ্গে লড়াই চাই। যে যে কাজটি করছেন, তাকে অন্তর থেকে মান্যতা দেওয়া চাই, ভালোবাসা চাই, নান্দনিকতা চাই। কী শিক্ষা, কী উৎপাদন, কী কলা, কী খেলা, কী রাজনীতি সর্বত্র। খোঁজ নেওয়া চাই নিজের অন্তপুরে, নিজের বিবেক যেখানে রাজত্ব করছে। Each soul is potentially free, আমরা প্রত্যেকেই মুক্ত। আমরা বিবেকের বন্ধনে কেবল আবদ্ধ। চাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা— মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বৌদ্ধিক জগতের স্বাধীনতা, অন্তরাত্মার স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধ তার চেয়েও জরুরি, ওখানেই যত কুমির হাঙ্গরের দল বসে আছে। নিশ্চয়ই সুনিশ্চিত করতে হবে অন্তেবাসী-প্রান্তবাসী মানুষের বেঁচে থাকার দাবি, বনবাসী-গিরিবাসী মানুষের দাবি। নারী স্বাধীনতার দাবি। তবে সেই দাবির মধ্যে সততা চাই। স্বাধীনতা রক্ষার সব চাইতে বড়ো অস্ত্র হলো ব্যক্তি সততা, দেশের প্রতি সততা, জাতির প্রতি সততা, রাজনৈতিক সততা। সততাই যথার্থ দেশপ্রেম। আমরা সেই দেশপ্রেমে বুঁদ হতে চাই। অধিকার আদায়ের নামে দেশপ্রেম-উৎপাটন করা এবং দেশকে দেউলিয়া করার ভণ্ডামি ভালো নয়। দেশীয় সুরক্ষা মঞ্চ থেকে পালিয়ে কৌশল পার্টি অব ইন্ডিয়ার নিত্যনতুন বুজরুকি এবার ত্যাগ করতে হবে। কারণ মানুষ এই দুষ্টু-রাজনীতি ধরে ফেলেছে। ▫

দশম শ্রেণীর স্কুল পাঠ্যে স্থান পাক বিশ্বজোড়া গণহত্যার ঘটনাগুলি

ড. তরুণ মজুমদার

যে শিক্ষা অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে বিকাশশীল চিন্তা চেতনার উৎকর্ষ সাধিত করে, যে শিক্ষা জীবনের চলার পথকে প্রসারিত ও সহজতর করে এবং ধর্মীয় ভাবাবেগ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ও মানবতার সার্বিক কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করার দীক্ষা দেয়, তাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যেতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা আহরণের সমস্ত উপাদানের মধ্যে সঠিক ইতিহাস অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞ জাতি মানসিক বিকারগ্রস্ততার শিকার হয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে ক্রমশ হারিয়ে যায়। যে ইতিহাস শিক্ষা যুব মননে নীতি- নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে অপারগ, যে ইতিহাস শিক্ষা যুব মননকে নিজের ঋদ্ধ ঐতিহ্য বিমুখ করে বিকৃত জড়বাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে পক্ষান্তরে দেশ বিরোধী জিহাদি শক্তির প্রাণবায়ু হয়ে উঠতে সহায়তা করে, সেই ইতিহাস শিক্ষাকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করানো আজ সময়ের দাবি। কারণ ১৯২০ সাল, যে বছর সুদূর তাসখন্দে জিহাদি শক্তির সহায়তায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল, সেই সময় থেকে আজ অবধি এই উপমহাদেশের ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে বারংবার দেখিয়ে দিয়েছে এদেশের বাম ইকোসিস্টেম হলো মস্তিষ্ক এবং জিহাদি মৌলবাদ তার অবয়ব মাত্র।

যুবসমাজের মনস্তাত্ত্বিক ভিত তৈরি হওয়ার সন্ধিক্ষণে যদি মানব সভ্যতার প্রকৃত শত্রুদের তারা চিনতে না শেখে তাহলে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শিক্ষা ব্যবস্থার ম্যানমেকিং মিশনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। নতুন শিক্ষা নীতির আওতায় নবম-দশম শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাক বিশ্বজোড়া গণহত্যার ঘটনাগুলি।

অবিদ্যার উপাসনা যেমন তমিস্রাকে বরণ করে নিতে শেখায়, তেমনি একশ্রেণীর বিকিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিকের কীট দংশিত ইতিহাস পড়ে এই উপমহাদেশের যুব সমাজ বস্তুকেন্দ্রিক বিকৃত সাম্যবাদের অনুরাগী হয়ে ভুল পথে চালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ইতিহাস চর্চা-সহ উচ্চশিক্ষা পুরোটাই বামেদের কুক্ষিগত হওয়ার ফলে ছাত্র-যুব মনন আধুনিক যুগের বৈশ্বিক গণহত্যাকারী বলতে শুধু অ্যাডলফ হিটলারকেই জানে ও বোঝে।

দেশের উচ্চশিক্ষায় জাঁকিয়ে বসে থাকা বিকৃত বাম ইকোসিস্টেম অত্যন্ত সুচতুরভাবে কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় মদতে চলা পৈশাচিক গণহত্যাগুলি সম্পর্কে হয় নীরব নয়তো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রপাগান্ডা বলে দাগিয়ে দিতে ব্যস্ত। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যারা ইতিহাস পড়েছেন একটু ভেবে বলুন তো যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া, উত্তর কোরিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে কমিউনিস্ট শাসকদের দ্বারা সংঘটিত বীভৎস গণহত্যাগুলি সম্পর্কে স্কুল পাঠ্যে পড়েছেন কী না? না, পড়েননি। ঠিক এখানেই এদেশের শিক্ষাজগতে রাজত্ব করা বৌদ্ধিক বাম ইকোসিস্টেমের সার্থকতা আর ঠিক ততটাই জাতীয়তাবাদী শক্তির ব্যর্থতা।

তিয়েনআন মেন স্কোয়ারে শত শত নিরীহ প্রতিবাদী ছাত্রকে গুলি করে মারার বামপন্থী কীর্তির স্মারক।

ছাত্রসমাজের সামাজিক মনন গড়ে ওঠার সন্ধিক্ষণে তাদের থেকে নিজেদের দেউলিয়া রাজনৈতিক দর্শনের পাপ সন্তর্পণে আড়াল করে মেকি শ্রেণী শত্রুতার বিষাক্ত বিষবাষ্পে ছাত্র মননকে জারিত করার এই নির্লজ্জ প্রয়াস আর চলতে দেওয়া চলে না। দেশের ছাত্রসমাজ পল পট, মাও সে তুং, নিকোলে চেচেস্কু, জোসেফ স্ট্যালিন, জোসেফ টিটো, কিম জং-উল নামক মানবতার শত্রুদের চিনুক। জানুক কোন মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে এই সব নরপিশাচরা পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। সময় এসেছে এদের বিকৃতির কদর্যতা যা বারেবারে মানব সভ্যতাকে কলঙ্কিত করেছে, তা ছাত্রসমাজের সামনে তুলে ধরার; ঠিক সে সময় যখন তাদের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত গড়ে উঠছে। এভাবেই জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধিক শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হোক এবং রাষ্ট্র তথা সমাজ, বাম ও জিহাদি শক্তি মুক্ত হয়ে পুনরায় গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে প্রবেশ করুক। দেশমাতৃকা জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক।

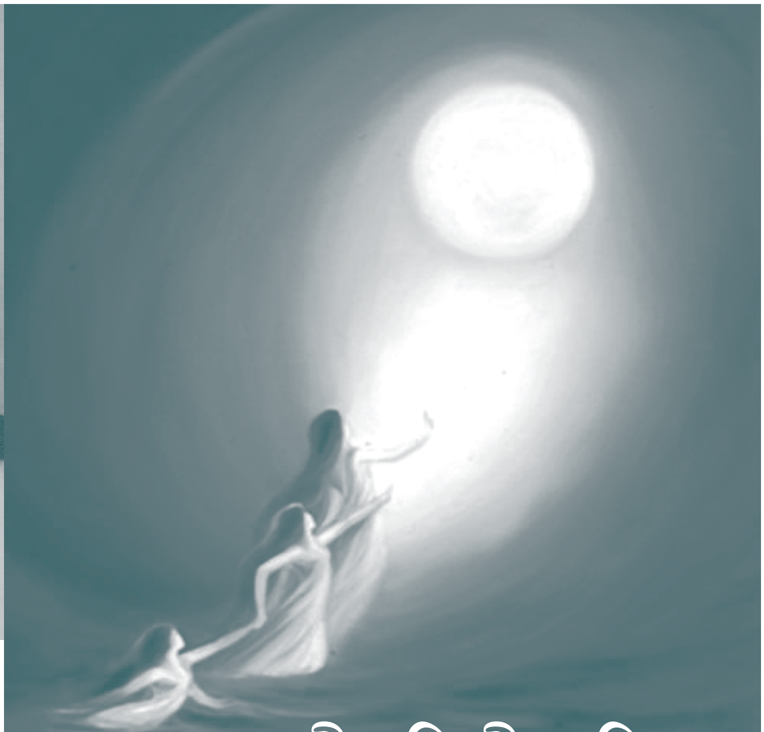

যোগী কবি শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রী : দর্শন ও বীক্ষণ

ড. প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী ও যোগী পরিচয়ের আড়ালে তাঁর কবি পরিচয়টি স্বল্প পরিজ্ঞাত। তার কারণও আছে। বিদেশি ইংরেজি ভাষা ছিল তাঁর কাব্য-সাধনার মাধ্যম। অল্প বয়সে বিলাত গিয়ে চৌদ্দ বছর বিলাতে বাস করেন। কেমব্রিজের ট্রাইপস (Tripose) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। গ্রিক ও ল্যাটিনে রেকর্ড মার্কস্ পান। অল্প বয়সেই তাঁর কাব্য রচনার শুরু। তাঁর প্রথম কবিতা Sounds of awakening Soul-এ দার্শনিক চিন্তার বীজ দেখা যায়। গ্রিক, ল্যাটিন, স্পানিস ও ইটালিয়ান ভাষায় কবিতা লিখে বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিঙের প্রশংসা পান। আইসিএস চাকুরির দাসত্ব না করে বরোদায় আসেন। এখানকার কলেজে অধ্যাপনার কালেই ভারতীয় সাহিত্যের রত্নরাজি— বেদ, উপনিষদ, পুরাণের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় ঘটে। বাঙ্গালি সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য বেতন দিয়ে বরেদায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন বারুইপুরে। বাংলা ভাষায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ইতিহাসের কী বিচিত্র ব্যাপার! জাতীয়তার Grandfather যাঁকে বলা হয়, সেই রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রকে বিলাত পাঠানো হলো, জাঁদরেল আইসিএস বানাবার জন্য। তিনি হলেন স্বদেশের সেবক— দুরত্যয়, দুর্গম স্বাধীনতা পথের সাগ্নিক অভিযাত্রী। তারপর স্বাদেশিক অরবিন্দ একদিন সাধক অরবিন্দে রূপান্তরিত হলেন। এই রূপান্তরের রূপকথার ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর কাব্যলোকের মর্মদেশে। কাব্য রচনায় যে ধ্রুপদী আঙ্গিক শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করলেন তা গ্রিক-ল্যাটিন সাহিত্যের গঠনশৈলী ও পরিভাষা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে সাধারণের কাছে তা অনেকাংশে দুর্বোধ্য রয়ে গেছে।

অবশ্য তাঁর মনীষার উপযোগী ভাবের বাহকরূপে এক নবরীতির ভাষাশৈলীর আশ্রয় তাঁকে নিতে হয়েছে। সে ভাষা বিদেশি হলেও জগতের বৃহত্তর জনসমাজের মুখ চেয়ে তাকে স্বীকার করতে হয়েছে। ভাবের ক্ষেত্রে কিন্তু কবি অরবিন্দ বৈদিক ঋষিদের উত্তরসাধক। মনে রাখতে হবে, আত্মমোক্ষ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। দ্রষ্টাগুরু 'লেলে'-র কাছে দীক্ষা নেবার পর অভিজ্ঞতার নিকষে ধরা পড়লো, একজন মানুষের অসামান্য সাফল্য, জগতের কল্যাণের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়— সমগ্র মানব সমাজকে হতে হবে অমৃতের অধিকারী। এই অধিকার অর্জিত হতে, প্রতিষ্ঠিত হতে দরকার সারা পৃথিবীব্যাপী এক রূপান্তরের। উর্ধ্ব হতে নির্বারিত স্রোতে নেমে আসা আলোক গঙ্গায় নব জীবনের হবে

অভিষেক।

যা খণ্ড, যা অপূর্ণ বা সীমায় বিধৃত, সত্য যেখানে অনুপস্থিত, আনন্দিত মিলনের বার্তা সেখানে অনুচ্চারিত। এই কথাগুলির পটভূমিকায় 'সাবিত্রী' মহাকাব্যকে উপলব্ধি করতে হবে। মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের চিরায়ত কাহিনিটিকে Legend Symbol রূপে অরবিন্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর প্রখ্যাত 'সাবিত্রী' কবিতায় লিজেন্ডকে অপ্রত্যক্ষ রেখে সিম্বলকে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে মণ্ডিত করেছেন, 'জাতির কনক পদ্ম বলে' অভিনন্দন জানিয়েছেন, সেখানে অরবিন্দ মহাভারতের এই সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনিকে Nucleus করে যে কাব্য-কাহিনির অবতারণা করলেন তাতে রূপ-রস-গন্ধময় এক নতুন জগতের দৃশ্যপট উন্মোচিত হলো। তাঁর সাবিত্রী 'মহোঅর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনায়' দার্শনিক চিন্তন-মননের এক অভূতপূর্ব রসমূর্তি সৃষ্টি করলেন কবি অরবিন্দ। কাব্যলক্ষ্মী তাঁর কাছে ধরা দিলেন প্রজ্ঞা পারমিতারূপে। সাবিত্রীর পিতা রাজা অশ্বপতির সন্তান কামনা,—তপস্যার রূপ ধরে ঊর্ধ্বগতি পথে, তা হলো মানবাত্মার অভিযাত্রার প্রতীক। যদুর্বেদেও 'ভূ' (পৃথিবী) থেকে 'ভূব'-এ, সেখান থেকে জ্যোতির্ময় লোকে যাবার কথা আছে। অরবিন্দ বলেছেন জড় দেহ Matter থেকে উঠি Life-এ (প্রাণে), তার থেকে এক মনোরম রাজ্যে প্রবেশ করি। এই মনোময় জগতেই অতিমানসের অবস্থান। তপস্যায় এই অতিমানসের (Supramental force) অবতরণ ঘটে— জগতের রূপান্তর ঘটাতে। খণ্ড হয় অখণ্ড, অপূর্ণ হয় পূর্ণ, সীমা হয় ভূমা। হেমদ্যুতি সাবিত্রী অতিমানস শক্তির প্রতীক। এই শক্তিকে গ্রহণ করবে, সে শক্তি কার? সত্যবানের। কারণ সে সত্যে বিধৃত। সত্যের চেয়ে বড়ো আধার আর কী আছে? কিন্তু দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান যে অল্পায়ু। তাঁর মৃত্যু একবৎসরের মধ্যে অবধারিত। মৃত্যু যে খণ্ড ও অপূর্ণতার প্রতীক। তাই সাবিত্রীর সহিত মিলনে ঘটবে তার রূপান্তর। সে মৃত্যুকে জয় করবে। হবে প্রেমের আনন্দলোকে সঞ্জীবিত। একথা শুধু সত্যবান সম্পর্কে সত্য নয়— সমগ্র মুমূর্ষু মানব সমাজ সম্পর্কেও সত্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে প্রথমে অন্ন-ব্রহ্মের কথা, পরে আনন্দ-ব্রহ্মই সর্বোত্তম তা বলা হয়েছে। সমগ্র জগৎ আজ অন্ন-পানীয়ের অভাবে মৃতপ্রায়, তার উজ্জীবন চাই। শুধু অন্ন-পানীয়ই তো মানুষের শেষ চাওয়া-পাওয়া নয়— ভূমার জন্যও তার আর্তি স্বীকৃত। স্থূলভোগ—কামিনী-কাঞ্চনের জন্য এ আর্তি নয়— Einstion একে বলেছেন— Inter harmony, কবি অরবিন্দ বললেন এ হচ্ছে— Because a Subtler and Vaster life is in birth.

শ্রীঅরবিন্দ শুষ্ক তপস্বী ছিলেন না, তাই তাঁর কাব্য মহাভারতের অমলিন শাশ্বত প্রেম-কাহিনি রূপায়িত। সাবিত্রী গ্রহণ করছেন দরিদ্র, অল্পায়ু, অসহায় সত্যবানকে। সাবিত্রী জেনেছেন সব পবিত্রতা, সততা, নিষ্ঠা সত্যবানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কারণ তিনি যে সত্যে স্থিত সত্যবান। তাই সাবিত্রী-সত্যবানের প্রথম দর্শন কবির অনুপম ভাষায় রূপান্তরিত—

To live to love are signs of infinite things.

Love is divine power by which all can change.

সাবিত্রী চির অপারাজিত— মৃত্যুকে তাঁর ভয় নেই। মৃত্যু অর্থে তো অপূর্ণতাকে স্বীকার, তাই যমকে তিনি দৃপ্তস্বরে বলছেন—

I bow not to thee, O huge mark of death

Conscious of immortality I walk a Victor Spirit.

যমের মুখে ব্যঙ্গের হাসি,— সামান্যা নারী, কোন্ শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধান ওলটাতে চাও!

সাবিত্রী বললেন— My God is love, Swiftly Suffers all; আছেন তিনি মাটিতে ধুলায়;— আকাশে বাতাসে তাঁর চরণধ্বনি ঝংকৃত। ঈশাবাস্য মিদং সর্বং— সর্বং খলুমিদং। এই জীবনের বিকাশ মাটিতে, কিন্তু তার অভিসার মহাকাশে। Our earth Starts from mud and end in Sky. —এই আকাশ ও মাটির সেতু প্রেম। এই প্রেমবলে অশঙ্কিনী সাবিত্রী দাঁড়ালেন যমের সম্মুখে, বললেন— মুক্তি দাও বদ্ধ মানবাত্মাকে, আত্মা যে চির স্বাধীন— Release the Soul of the world called Satyabans. সত্যবান যেন এ যুগের বদ্ধ, পীড়িত, শৃঙ্খলিত মানুষ— শক্তিরূপ সাবিত্রীর হাতে তার মুক্তির ছাড়পত্র। কবি অরিবিন্দের 'সাবিত্রী' রসোত্তীর্ণ, তার প্রমাণ— মহামতি ক্রোচের (V. Croce) কথা থেকে প্রমাণিত,—

"Poetic idealism is not frivolous embellisment but a profound penetration in Virtue of which we pass from troublous emotion to the Serenity of Contemplation."

সাবিত্রী কাব্যের ছত্রে ছত্রে Profound penetration— গভীর উপলব্ধির ব্যঞ্জনা, আর তা Serenity of Centmplation— অক্ষুব্ধ ধ্যানের জগতে আমাদের পৌঁছে দেয়। এ কাব্যের poetic idealism সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা বাচালতা। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'-তে কাব্যলোকের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত্ত। 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় টলস্টয়ের মতো— শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতি পুরস্কারটির মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস করেছে।

(শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

স্বাধীনতার বীর সেনানী ভগৎ সিংহ

ডাঃ আর এন দাস

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ভগৎ সিংহের স্মৃতিচারণ এজন্য প্রাসঙ্গিক যে ২৪ বছরের এই যুবক আজও আমামাদের কাছে এক আদর্শ চরিত্র।

১৯৩১-এর ২৩ মার্চ, সোমবার, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট। তিনটি তরতাজা স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ব্রিটিশ সরকার লোকচক্ষুর অন্তরালে রাতের অন্ধকারে গোপনে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল লাহোর জেলে, একই দিনে একই সময়ে। তাঁরা ছিলেন ভগৎ সিংহ, শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেব থাপার। তাঁদের অপরাধ ছিল তাঁরা দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

ভগৎ সিংহের জন্ম হয়, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সালে লাহোরের কাছে লায়লপুর শহরের বাঙ্গা গ্রামে। ধন্য বাবা সর্দার কিষেন সিংহ ও রত্নগর্ভা মা বিদ্যাবতী কৌর, যাঁদের নাম আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয় ভগৎ সিংহের সঙ্গে। বাবা ব্রিটিশের তৈরি ইংরেজি স্কুলের পরিবর্তে ছেলেকে আর্য সমাজ পরিচালিত দয়ানন্দ আর্য বিদ্যালয়ে পাঠান। তখনকার নাম ছিল, দয়ানন্দ অ্যাংলো বিদ্যালয়, যেখানে দেশীয় শিক্ষকরা জাতীয়তাবোধের শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও ইতিহাস শেখাতেন। এখানেই তিনি জীবনের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। সহপাঠীদের তুলনায় তিনি ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। গম্ভীর, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়শীল মনোযোগী ছাত্র। স্কুলের লাইব্রেরিটি ছিল তাঁর প্রিয় স্থান। জেলবন্দি অবস্থাতেই দেশি-বিদেশি ৫০ জন লেখকের ১৫০টি পুস্তক তিনি শুধু পড়া নয়, আত্মস্থ করেছিলেন। ছাত্র অবস্থাতেই অর্থনীতি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ইতিহাসের বইয়ের প্রতি অদম্য আকর্ষণ ছিল। অন্তিম ইচ্ছা ছিল, 'আবার যেন ভারতভূমিতে জন্মাতে পারি, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব ভগৎকে নতুন দিশা

দেখিয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ইনক্লাব জিন্দাবাদে সঙ্গে ভগৎ জুড়ে দেন 'সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ'। তিনি বলেছিলেন, 'ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তনে নয় বরং চিন্তাধারা ও ভাবনার পরিবর্তনেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। বিশেষ ব্যক্তি বা শাসনের দ্বারা অন্যের উপর অন্যায় অত্যাচার ও শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার মন্ত্রেই তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন। শিশু ভগৎ একবার উঠানে একটা বন্দুক মাটিতে পুঁতে জল দিচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়, 'এখানে অনেক বন্দুক ও গোলাগুলির চাষ হবে, যাতে করে ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ানো যাবে।'

শিশু ভগতের মস্তিষ্কে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল এক অপরিসীম ঘৃণা। ভগৎ সিংহ এক দেশভক্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। কাকা অজিত সিংহ ছিলেন একাধারে লেখক, বিচারক ও দেশভক্ত। তিনি পঞ্জাবে কিষাণ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। ইংরেজ শাসক তাঁকে ৪০ বছরের কারাবাসের শাস্তি দিয়েছিল। বাবাও ছিলেন এক দেশভক্ত বীর পুরুষ। তিনি লালা লাজপত রায়ের সহকর্মী ছিলেন। তাঁর এক ভাই সর্দার সুহেল সিংহকে ব্রিটিশ জেলে কলুর ঘানির সঙ্গে জুড়ে তেল তৈরি করাতো। অমানুষিক অত্যাচারে তিনি মাত্র ২৭ বছরেই মারা যান। ঠাকুরদাও ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করে জেলে গিয়েছিলেন। পৌত্র যাদুবিন্দর সিংহ সান্ধু সমতে চারপুরুষ ধরে ভগতের পরিবার দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

বাল্যাবস্থা থেকেই দেশভক্তি ও ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন ১২ বছরের ভগৎ সিংহ। ঘটনাটি শোনা মাত্রই গ্রামের স্কুলে পাঠরত ভগৎ ১২ কিলোমিটার পথ দৌড়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন সেই জালিয়ানওয়ালাবাগে যেখানে জেনেরেল ডায়ারের নির্দেশে ৫০ জন ব্রিটিশ ও গোর্খাসেনা ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু ও ডাঃ সত্যপালের আহ্বানে স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ বিশাল শিখসমাবেশের উপর মেশিনগান চালিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। বালক ভগৎ শিশিতে ভরে এনেছিল রক্তরঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি। শোকাহত নির্বাক ভগৎ দিদি অমর কৌরকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এর বদলা আমি নেব'।

সারাদেশে এমনকী ব্রিটেনের পার্লামেন্টেও এর ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রানির দেওয়া 'নাইট উপাধি' ত্যাগ করেন। ৫ হাজার বৃদ্ধ, শিশু, নারী ও পুরুষ সেদিন গুলিতে মারা যায়। রক্তস্নাত ময়দানের সেই দৃশ্য ভগৎ সিংহের মনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। চৌদ্দও পার হয়নি, অসমসাহসী ভগৎ সবার অলক্ষ্যে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে পড়ার সময়েই নাটককে জনগাগরণের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। তিনি 'বব্বর আকালি' দলের সদস্য হলে পুলিশের নজরে পড়ে যান। বিপ্লবীদের ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। ঠাকুমা বিয়ে দিয়ে সংসারে বাঁধতে চাইছিলেন। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ভগৎ কানপুরে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের কাছে আশ্রয় নেন। বাংলা শিখতে শুরু করলেন বাঙ্গলার বিপ্লবীদের কাছে বোমা তৈরি শিখবেন বলে। চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। কাঁকোরি বিস্ফোরণ মামলায় আসফাকুল্লা খান, রোশন সিংহ ঠাকুর ও রাজেন্দ্র

লাহিড়ীর ফাঁসি, ভগৎকে ভীষণভাবে বিচলিত করে। ওই তিন বীর বিপ্লবী পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের' স্থাপনা করেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর চন্দ্রশেখর আজাদ, সেই সংগঠনকে আরও মজবুত করেন 'হিন্দুস্থান রাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টি হিসেবে। তিনি 'বলবন্ত' ছদ্মনামে পাঞ্জাবি পত্রিকায় লিখতেন জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য। বাবাকে চিঠিতে জানালেন, ঠাকুরদাই তাঁকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েছেন। সুতরাং তিনি আর ঘরে ফিরবেন না! বাঙ্গলা তখন বিপ্লবের পীঠস্থান। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল বাঙ্গলার মাটি! যুগান্তর ও অনুশীলনের মতো গুপ্তসংস্থায় বোমা ও পিস্তলের তালিম নিলেন। সবার অলক্ষ্যে লাহোরে আসা-যাওয়া করছিলেন কিন্তু পুলিশ মিথ্যা বোমা মামলায় গ্রেপ্তার করে, ১৯২৬ সালে ৩ মাসের জন্য লাহোরের বরস্টেল জেলে বন্দি করে। সেসময়, জেলের লাইব্রেরিতে রাখা সমস্ত বই পড়ে ফেলেন। 'নও জোয়ান ভারত সভা' নামে এক বিপ্লবী সংস্থার পুরোধাও হন।

৩০ অক্টোবর, ১৯২৮ সালে 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনকারী শান্তিপ্রিয় লালা লাজপত রায়ের হত্যাকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ট জেমস স্কটকে মারার জন্য তিন বীর বিপ্লবী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ ও লাজপত রায়ের হত্যাকাণ্ডে প্রতিশোধের আগুন ভগতের মনে লেলিহান শিখায় পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে জয়গোপাল, ভগৎ সিংহ, বটুকেশ্বর দত্ত, শিবরাম রাজগুরু ও সুখদেব থাপারের পরিকল্পনা ছিল স্কটকে হত্যা করে ব্রিটিশ সরকারকে উচিত শিক্ষা দেওয়া।

চিনতে ভুল করায়, মারা পড়ল এক জুনিয়র অফিসার জন সান্ডারস (ডিসেম্বর, ১৯২৮)। ভগৎ পালাতে সক্ষম হলেন। সেদিনের মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে ভগবতীচরণ ভোরার ধর্মপত্নী দুর্গাবতী ছিলেন অন্যতমা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভগৎকে লাহোর থেকে বের করে আনার দায়িত্ব ছিল দুর্গাভাবীর উপর। ইতিহাসে আজও সেই মহীয়সী, অমর হয়ে আছেন ওই দুঃসাহসিকতার জন্য। গুরু আজাদের নিপুণ পরিকল্পনায়, দুর্গাভাবীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর ছদ্মবেশে ভগবতীচরণের ছেলেকে কোলে তুলে হ্যাট-সুট-বুট-টাই-এ সুসজ্জিত সাহেব ভগৎ রেলের কামরায় উঠে লাহোর থেকে অমৃতসরের পথে রওনা হলেন। সঙ্গে নিলেন ভৃত্যবেশী চিরসঙ্গী রাজগুরুকে। ধর্মের চেয়ে বড়ো দেশভক্তি। তাই নির্দ্বিধায় চুলদাড়ি কেটে কট্টর শিখপন্থী ভগৎ সমাজের কটাক্ষকে উপেক্ষা করে সাহেব হলেন। তাঁর বাবাকারাও এই রকম উদার মনোভাবের মানুষ ছিলেন।

৮ এপ্রিল, ২০২৯-এ বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে সোজা দিল্লির পার্লামেন্ট হলে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটান। সেদিন ভারতীয় প্রতিনিধিবিহীন সাত সদস্যের ইরেজ সরকারের আইনসভায় ভাইসরয় লর্ড এরউইন ও জর্জ সুসা উপস্থিত ছিলেন। ভারত বিরোধী বাণিজ্যিক বিতর্ক ও পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট পাশ করানোর কথা হচ্ছিল। প্রচণ্ড ধোঁয়া ও শব্দ সৃষ্টিকারী দেশি বোমা হাতে নিয়ে দর্শকপূর্ণ সভাগৃহে দুই মহাবীর ছদ্মবেশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কাউকে নিহত করার উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল না। ছিল ইংরেজ শাসকের বিরোধিতা করা ও জনগণকে সহিংসপন্থায় ব্রিটিশ বিতাড়নে উৎসাহিত করা! সদর্পে ছড়াচ্ছিলেন শুদ্ধ ইংরাজিতে লেখা ব্রিটিশের নির্মম অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে লেখা পোস্টারগুলি। ইচ্ছা করলে সেদিন অনেক লোকের প্রাণ নিতে পারতেন। সূর্য যখন মধ্যগগণে ধরাকে উত্তপ্ত করছে তখন ভারতমাতার ওই দুই বীর সন্তান নির্ভয়ে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'-এর ডাক দিচ্ছিলেন।

সভা ভঙ্গ হলো চারিদিকের তাণ্ডবলীলার মধ্যে। দিল্লিস্থিত ব্রিটিশ আদালতে ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলার উদ্দেশ্যেই তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন সেদিন। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। দেশব্যাপী 'বন্দে মাতরম ও জয় হিন্দ'-এর ধ্বনিতে উদ্বেলিত হলো!

যথারীতি নেহরু-গান্ধী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আবেদন খারিজ হলো। কিন্তু যুবসম্প্রদায়ের মনে এনে দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস ও ব্রিটিশ বিতাড়নের দৃঢ় সংকল্প। কয়েকমাস ধরে প্রহসনভরা আদালতে সাম্যবাদী ভগত, পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী, মূকবধির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু গর্জে উঠছিলেন। ক্রান্তিকারীদের উপর চলল নির্দয় ও অমানবীয় অত্যাচার। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল, ভগৎ কোনো সাধারণ হত্যাকারী নন! তিনি সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই শত্রু। তাই ফাঁসিই তাঁর উপযুক্ত শাস্তি। চতুর্দিকে বিপ্লবীদের ধরপাকড় শুরু হলো। হংসরাজ ভোরা, পি.এন.ঘোষ ও জয়গোপাল রাজসাক্ষী হলে, চন্দ্রশেখর আজাদ ছাড়া, ২১ জন বিপ্লবী ধরা পড়লেন। সুখদেব ও রাজগুরুরও ফাঁসির হুকুম হলো। মৃত্যুর তারিখ ঘোষণা হতেই অসহায় মা স্থানীয় গুরুদ্বারে অখণ্ড গুরুগ্রন্থ সাহেব পাঠের আয়োজন করলেন। অন্যদিকে ভগৎ আদলতে অন্তিম ইচ্ছা জানালেন, তাঁকে যেন ফাঁসি না দিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়! সারাবিশ্ব যাতে জানতে পারে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের নিরীহ ভারতবাসীর উপর অত্যাচার ও দমনপীড়নের কথা! জেলবন্দি অবস্থায়, রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা পাওয়ার জন্য দুই মাস অনশন করেছিলেন। সেসময় যতীন্দ্রনাথ দাশও ৬৪ দিন অনশন করে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯-এ শহিদ হন। চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতীচরণ ভোরা-সহ ভগতের অসংখ্য ভক্তশিষ্যরা তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভগত পালাতে রাজি হননি। গান্ধী-কংগ্রেসের আসনল রুপটা জনগণ তখনই জেনেছিল! মর্মাহত মালভিয়াজী ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।

তখনকার সর্বভারতীয় মান্য নেতা হিসাবে গান্ধী ভগতের মুক্তির জন্য ভাইসরয়ের কাছে আবেদন করতেই পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না। সাভারকারের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

ভগৎ জানতেন, তাঁর এই বলিদান ব্যর্থ যাবে না বরং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অসংখ্য ভগতের সৃষ্টি হবে। অন্তিম দিনে উকিলের বিদায়ের পরেই ভগৎকে জানানো হয়, ২৪ মার্চ সকালে নয়, ২৩ মার্চ রাত ২.৩০ মিনিটে তাঁদের তিনজনকে একসঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিশির আঁধারে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল জেলের বাইরে অপেক্ষারত সারাদেশের যুবসমাজের প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখেই। হাসি মুখে তিন বীর ফাঁসির দড়ি চুম্বন করে মাতৃভূমি রক্ষার্থে ব্রিটিশের বধ্যভূমিতে বলিদান দিলেন। নির্দয়তা ও নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন সেদিন ইংরেজরা। পৈশাচিক উল্লাসে শবদেহগুলিকে টুকরো করে আগুনে জ্বালিয়ে শতদ্রু নদীতে ফেলে দেয় তথাকথিত সভ্য সমাজের মুখোশধারীরা। ∎

ব্রহ্মদেশ ভেঙে পাকিস্তান বানাতে জিন্নার কাছে গিয়েছিল রোহিঙ্গারা

দুর্গাপদ ঘোষ

ব্রহ্মদেশের উত্তর আরাকান বা এখনকার রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা মুসলমানরা নিজেদের আরব ব্যবসায়ীদের বংশধর মনে করলেও কোনো কোনো মহল তাদের আদতে পূর্ববঙ্গীয় মানে মূলত বাঙ্গালি বলে মনে করে থাকেন। তবে এ নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা রয়েছে। ফরাসি পণ্ডিত জ্যাকিস লেইডারের বক্তব্য মোতাবেক রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় পূর্ববঙ্গ থেকে উত্তর আরাকানে গিয়েছিল। সেই সূত্রে তারা পূর্ববঙ্গীয় বাঙ্গালি এবং ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত নাকি এটাই ছিল তাদের পরিচয়। লেইডারের ভাষ্য অনুসারে বর্তমানে মায়ানমারে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা অসমে চট্টগ্রামি বা চলতি কথায় চাটগাঁইয়া। এই সূত্রে কেউ কেউ তাদের বাঙ্গালি ধরে নিয়ে আপ্লুত বোধ করেন। কেবল এই ফরাসি পণ্ডিতই নন, ক্রিস লেওয়া এবং অ্যানড্রিউ সেথ-এর মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতও পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কের কথা বলেছেন। অন্যদিকে নৃতত্ত্ববিদ ক্রিস্টিনা ফিঙ্ক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে রোহিঙ্গারা আদপেই পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের ভূমিপুত্র নয়। আর পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশ কোনো সময়েই তাদের সেখানকার অধিবাসী বলে মানেনি বা মানে না।

রোহিঙ্গাদের মূল কোনো এক সময়ে চট্টগ্রাম এলাকাই হোক কিংবা তাদের নিজেদের দাবিমতো আরব, তারা যে পূর্বতন ব্রহ্মদেশ তথা ১৯৮৯ সালে পরিবর্তিত নাম মায়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এটাই হলো বাস্তব ঘটনা। সেই সঙ্গে এটাও ইতিহাস যে স্বাধীনতার আগে থেকেই ভারতে মুসলিম লিগ এবং ব্রহ্মদেশে রোহিঙ্গাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার মধ্যে প্রায় একশো শতাংশ মিল লক্ষ্য করা গেছে। জিন্নার নেতৃত্বে ভারত ভেঙে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ব্রহ্মদেশের উত্তর আরাকানের মায়ু অন্তরীপ ভেঙে যাতে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের সঙ্গে মেলানো যায় সেজন্য ১৯৪৬ সালে রোহিঙ্গারা জিন্নার কাছে দরকার করেছিল। প্রস্তাব রেখেছিল ব্রহ্মদেশের মুংডা, বুথিডাং ও মায়ু এলাকা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান গড়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালে সোহরাবর্দির মদতে যেমন 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর ডাক দিয়ে নারকীয় দাঙ্গা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' চালিয়েছিল সেই একই বছরে ব্রহ্মদেশে রোহিঙ্গারাও তেমনি তাদের মুজাহিদিনদের মাধ্যমে বর্তমান রাখাইন এলাকায় সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়েছিল। ব্রহ্মদেশ রোহিঙ্গাদের সরকারিভাবে নাগরিকত্ব না দেবার ঘোষণা করে ১৯৮২ সালে। কিন্তু এই অস্বীকারের ব্যাপারটা চলে আসছে ১৯৪৮ সালের ১

জানুয়ারি ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ শাসকদের কবলমুক্ত হবার শুরু থেকেই। মুখ্যত এই নিয়েই বার্মা তথা মায়ানমার সরকারের সঙ্গে রোহিঙ্গারা দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধিয়েছে। সেই সঙ্গে সেদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বৌদ্ধদের সঙ্গে খুনি সংঘর্ষ চালিয়ে এসেছে স্বাধীনতার আগে থেকে। যার ফলে উত্তর আরাকান থেকে বৌদ্ধদের দক্ষিণ আরাকানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়। পরিণতিতে মায়ানমার বাহিনীর রোষানলে পড়ে প্রায় নিরন্তর সাধারণ রোহিঙ্গাদেরও সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে ঢুকে আশ্রয়ের সন্ধান করতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার লক্ষ্যে বৌদ্ধরা যখন জাপানি বাহিনীর পক্ষ নিয়েছিল, অন্যদিকে তখন উত্তর আরাকানের রোহিঙ্গারা জোটবদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশদের পক্ষে। সেজন্য ১৯৪৫ সালে ওই যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ বাহিনীর এক পদস্থ অফিসার অ্যানড্রিউ আরউইন রোহিঙ্গাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। তাতেই রোহিঙ্গা নেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা বর্তমানে মাউংডা জেলাকে মুসলমানদের জন্য পৃথক হোমল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯৪৬ সালে তারা উত্তর আরাকান এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে প্রস্তাবিত পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ডাক দেন। কেউ কেউ পৃথক ও স্বাধীন দেশের দাবিও করেন। কিন্তু তাঁদের ওই ডাক বা দাবির বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সমাজ প্রবল বিরোধিতায় নামে। যার ফলে ব্রিটিশরা রোহিঙ্গাদের পৃথক বাসভূমি দিতে অস্বীকার করে। কারো কারো মতে এর একটা বড়ো কারণ ছিল স্বয়ং জিন্নাই রোহিঙ্গাদের ওই প্রস্তাব বা দাবি মেনে নিতে রাজি হননি। রোহিঙ্গা নেতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে

ফঃ ৫

তিনি ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চান না। জিন্নার এই 'না' করে দেবার কারণ হিসেবে একাধিক মত ও ধারণা রয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো, জিন্নার মাথায় সম্ভবত অন্য ও বৃহত্তর পরিকল্পনা ছিল। তাহলো, বার্মার একটা ছোটো খণ্ডাংশ নয়, প্রথমে পাকিস্তানটা তৈরি করে নেওয়া। তারপর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার পর রোহিঙ্গা-সহ ব্রহ্মদেশের সমস্ত মুসলমানদের প্ররোচিত করে এবং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হানাদার বাহিনী পাঠিয়ে খনিজ তেল সমৃদ্ধ গোটা বার্মাকেই কবজা করে নেওয়া। বৃহত্তর ও শক্তিশালী পূর্ব-পাকিস্তান বানানো। ঠিক যে প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হানাদার বাহিনী পাঠিয়ে গোটা জম্মু-কাশ্মীর দখল করার জন্য। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেলের তৎপরতায় পশ্চিমে সেটা পুরোপুরি সফল না হওয়া অন্যদিকে স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মদেশের নেতারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার ফলে জিন্নার ওই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ভৌগোলিক দিক থেকে ব্রহ্মদেশ ছোটো দেশ হলেও মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে কয়েক দশক আগে সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি উ থান্ট সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের মতো পদে আসীন হয়েছিলেন। তাছাড়া জিন্না নিজেও অল্প দিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হন।

এদিকে রোহিঙ্গাদের পৃথক বাসভূমির স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়াতে তারা একের পর এক উগ্রপন্থী সংগঠন তৈরি করে রাখাইনে এলাকার বৌদ্ধ সমাজ এবং বার্মিজ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকে। জিন্নার কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার মাত্র দু'মাস পরেই বর্তমান রাখাইন প্রদেশের রাজধানী সিট্টে (তখন নাম ছিল আকিয়ার)-তে 'উত্তর আরাকান মুসলিম লিগ গঠন করা হয়। এর নেতারা মনে করেছিলেন 'মুসলিম লিগ' নামকরণ করে জিন্নার কাছে গেলে তিনি হয়তে পূর্ব-পাকিস্তানে মেশানোর প্রস্তাব মেনে নেবেন। কিন্তু জিন্না এই লিগ নেতাদের প্রস্তাবেও সাড়া দেননি। আর স্বাধীন বার্মা সরকার গঠিত হবার পর রোহিঙ্গারা নতুন সরকারের কাছে প্রস্তাব করা মাত্রই সরকার পত্রপাঠ তা বাতিল করে দেয়। এরপর তারা সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধানোর জন্য স্থানীয় রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে জেহাদি মনোভাবাপন্নদের নিয়ে মুজাহিদিন বাহিনী গড়ে তুলতে থাকে। প্রথম দিকে মির কাসিমের নেতৃত্বে সেই বাহিনী যুগপৎ সরকারি সেনা এবং স্থানীয় লোকেদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে রাখাইনের ভূমিপুত্রদের উৎখাত করতে আরম্ভ করে। ফলে অনেক ভূমিপুত্রকে প্রাণ বাঁচাতে পূর্ব-পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়। অনুপ্রবেশের চাপের মুখে পড়ে পাক সরকার বার্মা সরকারকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কার্যত সতর্ক করে দেয়। বার্মার প্রধানমন্ত্রী তখন উ নু। পূর্ব-পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে পাক সরকার বার্মার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি চটজলদি পে থিন নামে একজন মুসলমান কূটনীতিককে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন যাতে পাক সরকার মুজাহিদিনদের মদত করা থেকে বিরত থাকে। বলা বাহুল্য, নু-র এই কূটনীতি বেশ ভালো রকম সফল হয়।

১৯৫৪ সালে পাক সরকার মির কাসিমকে আটক করে। তার অনেক অনুগামীও বার্মা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে বার্মা সরকার আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলোতে অভিযোগ করতে থাকে যে প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে হাজার হাজার বাংলাভাষী আরাকান এলাকায় ঢুকে ঘাঁটি গেঁড়েছে ও তাদের একাংশ এখন মুজাহিদিন হিসেবে সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বার্মা সরকার মুজাহিদিনদের প্রতিহত করতে সরকারিভাবে প্রথম সেনা অভিযান চালায় ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে। এরপর ১৯৫২ সালের অক্টোবরে 'অপারেশন মায়ু' নামে বেশ বড়ো ধরনের সেনা অভিযান চালায়। বেশ কিছু মুজাহিদিন নেতা তখন অস্ত্রত্যাগ করে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। কিন্তু কার্যত তা করেনি। উলটে ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি তারা ফের স্থানীয় জনতা এবং মাউংডা, বুথিডাং ও রাথেডাং এলাকায় হামলা করতে থাকে। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে রাখাইনের হাজার হাজার বৌদ্ধ রাজধানী রেঙ্গুন (এখন ইয়াঙ্গন)-এর পথে নেমে অনশন ধর্মঘট শুরু করে। বেসামাল অবস্থা দেখে বার্মা সরকার সে বছরের অক্টোবর মাসে 'অপারেশন মনসুন' অভিযান পরিচালনা করে। তার তীব্রতায় শোর মুলুক এবং জুরা-র নেতৃত্বাধীন মুজাহিদিনরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৫০ দশকের শেষাশেষি তারা রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়ে। রোহিঙ্গাদের জঙ্গিপনা স্তিমিত হয়েছে দেখে সরকারি তরফে আরাকান এলাকার পুনর্গঠনের নীতি গৃহীত হয়। ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তান উভয় সরকার নিজেদের সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদিনদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নিয়ে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে ১৯৬১ সালের ১ মে আরাকানে 'মায়ু সীমান্ত জেলা' নামে একটা নতুন জেলা গঠন করা হয়। এতে বার্মার সেনাবাহিনীর উপপ্রধান লেঃ জেঃ আং গি-র কাছে কয়েকটা মুজাহিদিন গোষ্ঠী অস্ত্র সমর্পণ করলেও মৌলভি জাফর কাওয়াল, আবদুল লতিফ ও আবদুল জাউলির নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বাইরে থেকে গিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চালের চোরা কারবারে লিপ্ত হয়। এর এক দশকের মধ্যে মুজিবুর রহমনের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে শুরু হয় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কবলমুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ। অন্যদিকে ওই মুক্তিযুদ্ধের তালেগোলে মৌলভি কাওয়াল বেশ কিছু মুজাহিদিনকে জোটবদ্ধ করে ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই 'রোহিঙ্গা লিবারেশন পার্টি' (আর এল পি) গঠন করে ও ১৯৭৪ সালের মধ্যে তাদের জেহাদির সংখ্যা ৫০০-তে পৌঁছে যায়। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে কাওয়াল বাহিনী গিয়ে ঘাঁটি করে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে বুথিডাং-এর জঙ্গলে। খবর পেয়ে বার্মা সেনারা অভিযান চালালে মুজাহিদরা সে বছরের জুলাই মাসে সীমান্ত টপকে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে।

অন্যদিকে অন্যান্য মুজাহিদিনরা উত্তর আরাকানের স্থানীয়দের সমর্থন ও প্রশ্রয় পেয়ে হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। এটা প্রতিহত করতে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে

বর্মী সেনা 'অপারেশন নাগমিন' (অপারেশন ড্রাগন কিং) নামে ব্যাপক দমন অভিযানে নামে। তার ফলে মুজাহিদিনরা ছাড়াও তাদের সমর্থক-সহ বেশ কয়েক হাজার সাধারণ রোহিঙ্গা বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তখন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি ছিলেন জেঃ জিয়াউর রহমান। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চাপে তাঁদের দেশ বিধ্বস্ত হতে চলেছে দেখে তিনি বার্মা সরকারকে কার্যত হুমকি দিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে বার্মা যদি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে না নেয় তাহলে বাংলাদেশ সরকার তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেব। এতে বার্মা সরকার পরিষ্কারভাবে বুঝে যায় যে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয়-প্রশ্রয় কিংবা নাগরিক হিসেবে মেনে নেবে না। উলটে রোহিঙ্গারা প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান হলে ব্রহ্মদেশের পক্ষে তা মারাত্মক হতে পারে।

বার্মার শাসক নে উইন তখন রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে এবং 'আইনি অধিবাসী' (লক্ষণীয় নাগরিক নয়) হিসেবে ফিরিয়ে নিতে রাজি হন। তবে কূটনৈতিক চাল চেলে বলেন যে তা করা হবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের তত্ত্বাবধানে, যাতে রোহিঙ্গাদের নামে তাদের সঙ্গে মিশে বাংলাদেশিরাও বার্মায় ঢুকে না পড়তে পারে। বাংলাদেশের হুমকি, বার্মা সরকারের কূটনীতি এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানের আইনি প্রক্রিয়ার প্যাঁচ পয়জারের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া কার্যত শুরু হবার আগেই রোহিঙ্গাদের একটা উগ্রবাদী গোষ্ঠী 'রেহিঙ্গা পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট' ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে মহম্মদ ইউনিসের নেতৃত্বে 'রোহিঙ্গা সলিভারিটি অর্গানাইজেশন' (আর এস ও) তৈরি করে এবং মুসলমান ধর্মীয় ভাবাবেগকে তুঙ্গে তুলে মাঠে নেমে পড়ে। ইসলামের নামে জামাত-এ-ইসলামি, জিহব-এ-ইসলামি, হিজব-উল-মুজাহিদিন, আঙকাতুন-বেলিয়া, ইসলাম-সা-মালয়েশিয়া এবং মালয়েশিয়ার ইসলামিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন ইত্যাদির সমর্থন লাভ করে। সাপের হাসি হাসেন নে উইন। তাঁর কূটনীতি সফল হয়েছে দেখে সুযোগ বুঝে বার্মা সরকার ১৯৮২ সালের ১৫ অক্টোবর 'বার্মিজ সিটিজেনশিপ ল' চালু করে রোহিঙ্গা-সহ মুসলমান নাগরিকত্ব না দেবার কথা ঘোষণা করে দেয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে রোহিঙ্গা মুজাহিদিনদের উগ্রবাদের কারণে ব্রহ্মদেশে প্রায় সমস্ত মুসলমানেরই ভবিষ্যৎ যে তিমিরে ছিল তার চাইতেও গাঢ় অন্ধকারের গর্ভে চলে যায়। তারা যদি আর কিছুদিন সংঘর্ষ বিরতির অবস্থান নিত তাহলে বাংলাদেশ সরকার এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে হয়তো কোনও একটা সুরাহা হতো বলে মনে হয়। কিন্তু প্রায় তীরে এসে তরী ডোবার মতো ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশের ককসবাজার জেলায় রোহিঙ্গা সলিভারিটি অর্গানাইজেশন-এর জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরের খবর ফাঁস হয়ে যায় বার্টিল লিন্টার নামের এক সাংবাদিকের প্রতিবেদনে। ১৯৯১ সালে তিনি যে ফিল্ড রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে রোহিঙ্গা সলিভারিটি অর্গানাইজেশন-এর ওই শিবিরে লাইট মেশিন গান (এলএমজি), একে-৪৭ অ্যাসাল্ট রাইফেল, আরপিজি-২ রকেট উৎক্ষেপক, ক্লেমোর মাইন এবং প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক মজুত থাকার কথা প্রকাশ পায়। ২০০২ সালের মধ্যে আরও খবর মেলে যে রোহিঙ্গাদের উগ্রপন্থী নেতারা আফগানিস্তানে গিয়ে ওসামা বিন-লাদেনের আল-কায়েদা এবং বদরুদ্দিন হেকমেতিয়ারের তালিবানদের সঙ্গে দেখা করেছে। একদিকে যখন এইসব খবর মিলতে থাকে অন্যদিকে মায়ানমারি সেনারাও তখন দফায় দফায় রোহিঙ্গা সফাই অভিযান চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে নিরন্তর চলতে থাকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে এবং তাদের একাংশের ভারতে অনুপ্রবেশ। এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৬ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকেছে বলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমান। আর একটা তথ্য বলছে, সে বছরের ২৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর অর্থাৎ মাত্র ৪ মাসের মধ্যে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার থেকে ৭ লক্ষ রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলাদেশে।

রোহিঙ্গদের বিরুদ্ধে মায়ানমার সেনা দমন পীড়ন চালাচ্ছে বলে যেমন বার বার অভিযোগের আঙুল উঠেছে, পাশাপাশি ২০১৮ সালের ২২ মে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায় যে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' মায়ানমারে হামলা চালিয়ে ৯৯ জন হিন্দু নাগরিককে হত্যা করে। সেদিনই রোহিঙ্গাদের ওই সংস্থা মায়ানমারি নিরাপত্তারক্ষীদের ওপরও সশস্ত্র হামলা চালায়। জুন্টা সেনারা পালটা ব্যবস্থা নিলে রোহিঙ্গাদের পলায়নের মাত্র বলতে গেলে মাত্রাছাড়া হয়ে যায়। সেসময় রাষ্ট্রসঙ্ঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি তাঁদের দেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বরদাস্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এর বছর খানেক পরে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৭৩তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান যে তাঁর দেশে কমপক্ষে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। আন্তর্জাতিক নেতাদের কাছে কালবিলম্ব না করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আর্জি জানান তিনি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যে সত্যিসত্যিই মারাত্মক ও উদ্বেগজনক তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। উল্লেখ হাসিনা সরকার ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে একটা দ্বীপে ত্রাণ শিবির গড়ে আলাদা করে রেখেছে।

এখন যে বিষয়টা উল্লেখ না করলেই নয় তাহলো, ভারতে এখনই বিশ্বের অন্তত ২৬টি দেশের মোট ৩ লক্ষাধিক স্বীকৃত শরণার্থী রয়েছে। তার ওপর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে যে বেহাল দশা, বিশেষ করে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে, তাতে সরাসরি মায়ানমার থেকে কিংবা বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যাতে কোনো রোহিঙ্গা কিংবা কোনও বাংলাদেশি আর অনুপ্রবেশ না করতে পারে এবং তারা কেউ যাতে এখানে 'শরণার্থী' মর্যাদা লাভ করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতেই হবে। মানবতাবাদের নামে কোনো দেশ বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চলে রূপান্তরিত হতে পারে না। বিশেষ করে এক সময় যারা নিজেদের দেশ ভেঙে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে জিন্নার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং যারা আলাদা দেশ পাকিস্তান বানিয়েছিল তাদের সম্পর্কে রীতিমতো সজাগ থাকা ও কঠোর মনোভাব নেওয়া নিজেদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তারা যে আজ সুঁচ হয়ে ঢুকে কাল ফাল হয়ে দাঁড়াবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? ▯

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে উড়ছেন মমতা ব্যানার্জি

ড. কুণাল ভট্টাচার্য

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে পরাজিত করার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরোধী দলের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা বেড়েছে। তাই তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার আশাও বেড়েছে। অতীতে, বাঙ্গালি বেশ কয়েকবার প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। জ্যোতি বসু ১৯৯৬ সালে কেন্দ্র-বাম যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর দল সিপিআই (এম) তাকে অনুমতি দেয়নি। সেটি পরে এক 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে মনে করা হয়েছে।

প্রণব মুখার্জি কমপক্ষে ৩ বার সুযোগটি হারিয়েছিলেন। প্রথমবার, ১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দু' নম্বর মন্ত্রী হিসেবে তাঁর মৃত্যুর পর। দ্বিতীয়বার, ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর এবং আবারও ২০০৪ সালে যখন সোনিয়া গান্ধী যখন মনমোহন সিংহকে তাঁর বদলে বেছে নিয়েছিলেন।

মমতা ব্যানার্জির আশা নতুন করে তৈরি হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে পুরো বিজেপি ব্রিগেডের বিরুদ্ধে বিশাল জয় তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য উদ্‌গ্রীব করে তুলেছে। তিনিই নাকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের শক্তিশালী জুটিকে প্রতিরোধ করতে পারেন।

একটি হ্যাশট্যাগ---#BengaliPrimeMinister-এর পাশাপাশি মমতা ব্যানার্জির ছবি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ২০২৪ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকায়, প্রচার বেশ কিছুটা তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছে।

কিন্তু বিরোধী নেতারাই বলছেন, মাঠে আরও কিছু খেলোয়াড় রয়েছেন যারা মমতাকে মসৃণ ওয়াকওভার দেবেন না। তাই মমতার প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন পূরণ হবে না। কারণ—

১. ২০১৬ সালে বিজেপির রাজ্য বিধানসভার মাত্র ৩ জন বিধায়ক ছিল। এখন ৭৭টি। যা ২৫০০ শতাংশ বা ২৫ গুণ বেশি। সুতরাং বিজেপি অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রবল প্রতিপক্ষ।

২. পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি সংসদীয় আসনের মধ্যে, ২০২৪-এ টিএমসি সর্বাধিক ৩৪ থেকে ৩৮টি আসন পাতে পারে। যা ২৭৩-এর সরকার গঠনের চেয়ে অনেক কম। সুতরাং মমতার প্রধানমন্ত্রী হওয়া একটা বোকাদের স্বপ্ন।

৩. উত্তরপ্রদেশে ৮০টি আসন। প্রায়শই বলা হয় যে দিল্লির রাস্তা উত্তরপ্রদেশ দিয়ে। মানে উত্তরপ্রদেশ জিততে হবে। ইউপিতে টিএমসি-র কোনও উপস্থিতি নেই। অখিলেশ একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তিনি মমতাকে এক ইঞ্চি পরিমাণের জমি ছাড়বেন না, কারণ মমতা পশ্চিমবঙ্গে অখিলেশের সঙ্গে একটি আসনও ভাগ করতে রাজি নন।

৪. আমরা যাই বলি না কেন, সারা ভারত ভিত্তিতে কংগ্রেসের ২০ শতাংশ ভোট রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেসের উপস্থিতি রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোনও রাজ্যে টিএমসি-র কোনও উপস্থিতি নেই। এর আগে ত্রিপুরা ও অসমে এদের উপস্থিতি ছিল। এক সময়ে কেরল ও ইউপি-তেও এদের উপস্থিতি ছিল। এখন সেখানে শূন্য।

৫. সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য কংগ্রেস অন্য কোনও দলের জন্য মমতাকে জমি ছাড়বে এমন সম্ভাবনা খুব কম। তার আগে টিএমসি-কে ইউপিএ-তে যোগ দিতে হবে, যা তারা এখনও করেনি। তার সম্ভাবনাও খুব কম।

৬. ২০২৪ সালের সংসদ নির্বাচন। এর

মধ্যে ১৫টি রাজ্য নির্বাচন রয়েছে। যার মধ্যে ২০২২ সালে ইউপি, এমপি ও কর্ণাটক। এগুলি সমস্ত বড়ো রাজ্য এবং এই রাজ্যগুলিতে টিএমসি-র কোনও উপস্থিতি নেই, এই রাজ্যগুলির সঙ্গে টিএমসি-র কোনও সংযোগও নেই।

৭. ২ থেকে ৩ বছর আগে যা ঘটেছিল তা মানুষ সাধারণত ভুলে গিয়েছে। এই করোনা মহামারী টিকাকরণ এবং অক্সিজেন ঘাটতি ২০২৪-এর নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না। সেই সময় নতুন সমস্যা হবে। সুতরাং এখন কীভাবে মমতা জিতেছেন তার ৩ বছর পরে কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না।

৮. যদিও বর্তমানে মোদী হাওয়া আঞ্চলিক দলের হাতে মার খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ সংসদে এবং বিধানসভার মধ্যে আলাদাভাবে ভোট দেয়। ৭০ থেকে ৭ ও ৭০ থেকে ৫০-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং মোদী হাওয়া কতটা ক্ষয় হবে তা কেবল ভবিষ্যৎই বলবে। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে রাজ্যসভায় বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে 'মোদী হাওয়া' প্রবল হতে পারে। সেখানে ২০-২৫টি বিল পাশ করা হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিল এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

৯. মমতা পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, কিন্তু সারা ভারতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন না। তিনি অন্যান্য রাজ্যের লোকদের 'বহিরাগত' হিসেবে দেখেন। সুতরাং তাকে ভারতের নেত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কোনও সুযোগ নেই।

১০. যদিও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেড্রেক-ও-ব্রায়ানের মতো টিএমসি-র সাংসদ এবং রাজ্যসভার সদস্যদের সম্প্রতি অন্য রাজ্যে টিএমসি সম্প্রসারণের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে এবং এখন মুকুল রায় তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। তাহলেও মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হওয়া খুব কঠিন কাজ।

১১. যে কেউ বিজেপির বিরুদ্ধে জিতেছেন তিনিই সবাই ভাবতে শুরু করেছেন যে তিনি সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। যেমন পঞ্জাবে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ, দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিহারের নীতীশ কুমার, ওড়িশার নবীন পট্টনায়েক, অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি ও কেরলের পি বিজয়ন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার বহুজন।

মহারাষ্ট্রের শরদ পাওয়ার এবং ইউপি-র মুলায়ম সিংহ যাদবের মতো দুই মহারথীও প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে আছেন। ইউপি-র মায়াবতীও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ২৭৩-এর যাদুকরী চিত্র পেতে মমতাকে এই সমস্ত লোকদের পরাজিত করতে হবে যা একেবারে অসম্ভব।

১২. অতীতে আরও সম্ভাবনাহীন প্রার্থীরা এই পদে এসেছেন। দেবেগৌড়া বা আই কে গুজরাল জাতীয় নেতা ছিলেন না, তারা নিজেদের রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন। চরণ সিংহ, চন্দ্রশেখর, আই কে গুজরাল ও দেবেগৌড়াদের মতো ৮০-৯০-এর দশকের প্রধানমন্ত্রীরা খুব স্বল্পস্থায়ী। তাদের বেশিরভাগই এক বছর পূর্ণ করতে পারেননি, কারণ কংগ্রেস তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এর মধ্যে কেউ কেউ সাংসদও হননি। মমতা ব্যানার্জিও কয়েক দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশায় রয়েছেন, তবে তাঁর ভাগ্যও এই লোকেদের মতোই হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মমতার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, স্বপ্ন হিসেবেই থেকে যাবে।

(লেখক ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার

যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

সুশ্রুত

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ শুশ্রুতের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনলেন কে যেন দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। দেওয়াল থেকে মশালটি নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— ‘ কে ওখানে?’ জবাব এল— ‘ আমি পথিক, অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমাকে একটু সাহায্য করুন।’ দরজা খুলে দেখলেন একটি লোক হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তার দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছে। লোকটির নাক রক্তাক্ত ও বিকৃত। সুশ্রুত সস্নেহে লোকটিকে ঘরে আসতে বললেন ও সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— চুপ করে বসো। এখনই ঠিক হয়ে যাবে।’

তিনি লোকটিকে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরের দেওয়ালে অস্ত্র চিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জাম সাজানো ছিল। এরপর তিনি লোকটিকে একটি গদিতে বসতে বললেন। তারপর লোকটির পোশাক ছাড়িয়ে তার মুখ প্রথমে জল দিয়ে ও পরে লতাগুল্মের রস দিয়ে ধুইয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাকে একপাত্র পানীয় পান করতে দিয়ে অস্ত্রচিকিৎসার প্রস্তুতি শুরু করলেন। বাগান থেকে লতা নিয়ে এসে তিনি লোকটির নাকের মাপ নিলেন। দেওয়াল থেকে ছুরি ও চিমটা নিয়ে এসে সেগুলি আগুনে পুড়িয়ে লোকটির গাল থেকে খানিকটা মাংস কেটে নিলেন। লোকটি যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলেও বিশেষ পানীয় পান করার ফলে যন্ত্রণা অনেরটা কমে গিয়েছিল।

এরপর তিনি গালের সেই অংশটা পটি দিয়ে বেঁধে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নাকে দুটো নল ঢুকিয়ে সেই মাংস বিকৃত নাকের উপর লাগিয়ে দিলেন। মাংস দিয়ে নাকের আকৃতি ঠিক করে দিয়ে তার উপর একরকম শেকড়ের গুঁড়ো, রক্তচন্দন ও একজাতের ফলের রস ছড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি নাকের উপর তুলো ও তিসির তেল দিয়ে ভালো করে পট্টি বেঁধে দিলেন।

এঅবস্থায় কী করা উচিত ও কী করা উচিত নয় তা লোকটিকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। তাকে নিয়মিতভাবে কিছু ওষুধ খাবার কথাও বললেন। কয়েক সপ্তাহ বাদে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করার জন্য আসতে বলে দিলেন।

প্রায় তিনহাজার বছর আগে সুশ্রুত যেভাবে অস্ত্রোপচার করে বিকৃত নাক ঠিক করে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আজকালকার প্লাস্টিক সার্জারির মূলত কোনো পার্থক্য নেই। সত্যি কথা বলতে কী, সুশ্রুতকে সারা পৃথিবীর প্লাস্টিক সার্জারির জনক বলা হয়। তাঁর লেখা সুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত যেসব তথ্য পাওয়া যায় আজকালকার দিনেও তার যথেষ্ট মূল্য আছে। এথেকেই বোঝা যায় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারতবর্ষ বাকি পৃথিবী থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুশ্রুত সংহিতা আরবে আরবিভাষায় ‘কিতাব-শ-শুন-এ-হিন্দ-ই’ এবং ‘কিতাব-সুশ্রুদ’ নামে অনূদিত হয়।

বৈদিক ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধর সুশ্রুতের জন্ম খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তিনি বারাণসীতে দিবোদাস ধন্বন্তরীর আশ্রমে চিকিৎসা ও অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করেন। তিনিই প্রথম সিজারিয়ান অস্ত্রচিকিৎসার বিধান দিয়েছেন। সেই আমলেই অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা মূত্রাশয়ের পাথুরি বের করা, ভাঙা হাড়ের চিকিৎসা এবং চোখের ছানি কাটায় তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনি অস্ত্র চিকিৎসায় ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করার কথা বলেছেন। তাঁকে আধুনিক অ্যানেসথিসিয়ার জনকও বলা হয়। তাঁর গ্রন্থে অস্ত্রচিকিৎসার ১০১টি যন্ত্রপাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ▯

ভারতের বিপ্লবী

অনাথবন্ধু পাঁজা

বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজার জন্ম ১৯১১ সালের ২৯ অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার জলবিন্দু গ্রামে। তিনি ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সক্রিয় সদস্য। চরম অত্যাচারী বার্জ সাহেব ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। ওই বছরই ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর কলেজমাঠে ফুটবল খেলতে নামলে খেলা প্র্যাকটিসের ছল করে মাঠে বল নিয়ে নামেন অনাথবন্ধু ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। মাঠেই দুই বন্ধু সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন। উপস্থিত পুলিশ গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই অনাথবন্ধু বীরগতি প্রাপ্ত হন।

জানো কি?

ভারতীয় মনীষীদের নাম ও উপনাম

● বাল্মীকি– আদিকবি ● বিবেকানন্দ– স্বামীজী ● সুভাষচন্দ্র বসু–নেতাজী ● মদনমোহন মালব্য-- মহামান্য ● চিত্তরঞ্জন দাশ– দেশবন্ধু ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–গুরুদেব ● গান্ধীজী– বাপু ● জওহরলাল নেহরু–চাচা ● এম এস গোলওয়ালকর–শ্রীগুরুজী ● এপিজে আবদুল কালাম– মিসাইলম্যান ● বীরেন্দ্র শাসমল-- দেশপ্রাণ ● যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত-- দেশপ্রিয় ● মাতঙ্গিনী হাজরা–গান্ধীবুড়ি . ● গোপাল কৃষ্ণ গোখলে– মহামতি

ভালো কথা

কুকুরের ঘর

রাস্তার কুকুরগুলো বৃষ্টি হলে খুব কষ্ট পায়। বিজু ওদের বন্ধু। বিজুরাও কষ্ট পায়। ওদের বাড়ি নেই। রাস্তার ফুটপাতে থাকে। এবার বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বিজু পলিথিনের ফ্লেক্স দিয়ে ফুটপাতের দেওয়াল ঘেঁসে ছোটো ছোটো ঘর তৈরি করেছে। আমাকে দেখে বলেছিল, দিদি, কুকুরের ঘর তৈরি করছি। আমি বললাম খুব ভালো। কয়েকদিন আগে কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। আমি পাউরুটি নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দেখি একটাও কুকুর নেই। বিজু ওদের পলিথিনের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, দিদি ওরা ওদের ঘরের ভিতরে আছে। আমি তুতু আয় আয় বলে ডাক দিতেই ছোটে ছোটো ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে কুই কুই করতে লাগল। আমি কাছে গিয়ে এক এক করে ওদের মুখে পাউরুটির টুকরো দিতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি বিজু আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল।

বীথিকা দাস, একাদশ শ্রেণী, বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

তুমি আর এসো না

শ্রেয়া ঘোষাল, অষ্টম শ্রেণী, ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

মহামারী করোনা তুমি আর এসো না
মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না।
কত প্রাণ নিলে তুমি কতজনে ছারখার
জীবন জীবিকায় পড়ে গেছে হাহাকার।
দুটি বছর হতে চলে স্কুলও খোলে না
তাই বলি করোনা তুমি আর এসো না।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

বিপর্যয় থেকে বাঙ্গালির উত্তরণ

সৌমদীপ কুণ্ডু

এটা একটা বিপর্যয় না উত্তরণ। ২০২১-এর মহারণ শেষ। মাঠে পড়ে আছে বোমের সুতুলি। কুঁচো পাথর, বুলেটের খোল। এ যেন যুদ্ধের অবসান। সম্মুখসমরে আমার ভাই, আত্মীয়, আরেকদিকে আমি। বিগত ৪৪ বছর ধরে বাঙ্গালির রাজনৈতিক সচেতনতা বাঙ্গালিকে একে অপরের বিরুদ্ধে ধরতে বাধ্য করিয়েছে বন্দুকের নল। বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' এই নীতিতে বাঙ্গালি বিশ্বাসী। তাই ভোটের দামামা স্তব্ধ হতেই রাস্তায় পড়ে আছে লাশ, ধর্ষিতার হাহাকার।

এবারের নির্বাচন এমন এক সময়ে সংগঠিত হলো যখন করোনা ভাইরাস তার রং বদলে বদলে ত্বরান্বিত করছে সভ্যতার সংকটকে। এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে যখন নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় তখন এই মহারণ। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একদিকে বাঙ্গালি অন্যদিকে তারই পরিজন আরেক বাঙ্গালি, অথচ দুজন দুজনকে পারলে খুন করতে উদ্যত, উদ্ধত। এখন এমন একটা সময় যখন বাঙ্গালি ভুলে গেছে তার গর্ববোধ, জাতীয়তাবোধ। বাঙ্গালি ঋষি অরবিন্দ, সুভাষের অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন থেকে আজ বিদেশি তত্ত্বে অনুপ্রাণিত। যে তত্ত্ব বাঙ্গালিকে একদিন দাঁড় করিয়ে দেবে বিহারির সম্মুখে, বিহারিকে একদিন দাঁড় করিয়ে দেবে পঞ্জাবির সম্মুখে, পঞ্জাবিকে একদিন দাঁড় করিয়ে দেবে গুজরাটির সম্মুখে। এভাবে একদিন দ্বিজাতিতত্ত্বে বিভক্ত হওয়া খণ্ডিত ভারত আবার টুকরো টুকরো হবে। আর বাঙ্গালি বেহালা বাজাবে, সুর ভাজবে, লালা ঝরাবে বাঙ্গলার পাউচে।

এবারের নির্বাচন মূলত ছিল তৃণমূল ও বিজেপির লড়াই। একদিকে বেকারের আর্তনাদ, স্বাস্থ্যসাথীর প্রতিশ্রুতি আর অন্যদিকে সোনার বাঙ্গলার স্বপ্ন। 'বাঙ্গালি বামপন্থী' একথা আমার নয় স্বয়ং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। বাঙ্গলায় ক্ষমতাসীন অনুপ্রেরণা দেবীর ডক্টরেট উপাধি নিয়ে চ্যালেঞ্জ হতে শুনেছি, কিন্তু কেউ প্রণববাবুর ডক্তরেটকে চ্যালেঞ্জ করেছে শুনিনি। বামপন্থার ৩৪ বছর বাঙ্গালিকে ক্লাববাজি, সিন্ডিকেট বাজি, তোলাবাজি থেকে শুরু করে নিজের ভাইয়ের রক্তে হোলিখেলা নরখাদক বানিয়ে দিয়েছে। থুড়ি বিপ্লবী বানিয়ে দিয়েছে লং মার্চের মাও, লেনিনের মতাদর্শে। আর সেই লেনিন, মাওদের শিষ্য যাদের কিনা সরাতে ২০১১ সালে পরিবর্তন এনেছিল বাঙ্গলার মানুষ, তারাই এখন ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেসের কাছাকাছি চলে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী নিজেকে একজন আদর্শ বামপন্থী হিসেবে তুলে ধরে বিগত ৩৪ বছরের অলস বাঙ্গালির তোলাবাজি, সিন্ডিকেট বাজি ও বোমা শিল্পকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে অকাতরে।

অন্যদিকে ভারতীয় জনতাপার্টি বাঙ্গালির কাছে বলতে গেলে একটি নতুন দল। বামপন্থী শিক্ষা, সাহিত্য বেশিরভাগটাই পাশ্চাত্য প্রবণ। আমরা মুদ্রাপ্রচলনকারী, বঙ্গাব্দ ক্যালেন্ডারের প্রবর্তক রাজা শশাঙ্কের চেয়ে অবাঙ্গালি নবাব সিরাজদৌল্লাকে স্বীকৃতি দিতে বেশি আগ্রহী। তাই মুর্শিদাবাদ সিরাজের ইতিহাসে সমৃদ্ধ অথচ এক কোণে পড়ে থাকে কর্ণসুবর্ণের ফসিল। রাষ্ট্রবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জনসঙ্ঘ জরুরি অবস্থার পর রূপান্তরিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টিতে। এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালি হলেও তার আদর্শ, ঘরানা বাঙ্গালির কাছে একেবারে নবীন।

বেশ দু-তিন বছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সান্নিধ্যে আসার সুবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির পেছনে যে আদর্শবোধ, দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি এবং জাতীয়তাবাদী ভাবনা চিন্তা কাজ করে তা অনুভব করেছি। এই বাঙ্গলায় আমরি সভ্যতার সময়কালীন ভাঙ্গারিডি রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যায়, এই বাঙ্গলার দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে মুকুটমণিপুর একের পর এক যে হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন তা খুবই সীমিত আকারে ইতিহাস বইতে বর্ণিত। বাঙ্গালি ভুলে গেছে সুহৃদ দত্ত, দেবু মালিকের কথা অথচ সেই বিতর্কিত ইতিহাস বাঙ্গালিকে পড়তে হচ্ছে। সেই প্রাচীন ভারত তথা প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস (যা কিনা মোগলরা আসার পর হঠাৎ শুরু হয়নি)-এর একটি গাথা আছে তার সেই কথকতা এখনো পড়ে আছে কৃষকের লাঙ্গলে। মায়ের তুলসীমঞ্চে।

২০২১-এর নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ৩ জন বিধায়ক থেকে ৭৭ জন বিধায়কে এসে পৌঁছেছে। অথচ প্রচার চলছে ভারতীয় জনতা পার্টি মুছে গেছে, উড়ে গেছে। আসলে এটা একটা প্রোপ্যাগান্ডা, স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট হিটলারি শাসনের গোয়েবলসীয় প্রচার। বিগত ১০ বছরে এই ধ্বংসাত্মক তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচার ছাড়িয়ে গেছে ৩৪ বছরের হাড় হিম করা বামপন্থী শাসনকে। বাঙ্গলা এগিয়ে নারীপাচারে, ধর্ষণে, বেকারত্বে, কলকারখানার কংকালে। আজ সারা দেশ ভারতমাতার জয় স্লোগানে আপ্লুত অথচ এই ভারতমাতার জন্ম ঋষি বঙ্কিমের কলমে, প্রাণ দান ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ, স্বামী বিবেকানন্দের হাতে। এই নির্বাচন বিপর্যয়ের নয়, বরং অভ্যুত্থানের। বিশ্ববন্দিতা ভারতমাতার বাঙ্গালি সন্তান হিসেবে তার ব্যাটম তুলে নিতে হবে রাষ্ট্রবাদীদের। কারণ, বাঙ্গালির উত্তরণ শুরু হয়েছে। ▯

শিক্ষাদীক্ষায় ভারতবর্ষ ছিল পৃথিবীর পথপ্রদর্শক

সন্দীপ সেনগুপ্ত

প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর বহু দেশে সভ্যতাই গড়ে ওঠেনি, তখন ভারতবর্ষে গুরুকুল (বিদ্যালয়) এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রথা খুব গৌরবজনক ও সহজ ভাবে ব্যাপ্ত ছিল। আমাদের দেশে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর বা তারও পূর্বের গুরুকুল প্রথার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেটা বৈদিক যুগ ছিল বলে সেই শিক্ষাকে বৈদিক শিক্ষাও বলা হয়। পশ্চিমের তথাকথিত সভ্য দেশগুলি শিক্ষার্থীদের যেই হলিস্টিক ডিপার্টমেন্টের কথা এখন বলছে, সেই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশে পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল। ব্রিটিশ সরকার সুপরিকল্পিত ভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অনেক পরে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরায় শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবর্তিত করেন। বৈদিক শিক্ষা কেমন ছিল এবং দেশ ও দেশবাসীর উপর সেই শিক্ষার কী প্রভাব ছিল, কয়েকটি তথ্যের মাধ্যমে আমরা সেইগুলি বুঝতে পারব।

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি স্তর ছিল; যথা— গুরুকুল শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। এটা আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ও শিক্ষা আরম্ভের বয়স ধরা হতো ৮-১২ বছর। একেবারে প্রথম দিকে গুরুকুলে পড়ানো হতো বেদ, যোগ সম্পর্কিত সাহিত্য ও কলা, ছন্দ, শব্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ইত্যাদি। সময় এগোনোর সঙ্গে এতে যুক্ত হলো প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা, অঙ্কের বিভিন্ন বিভাগ, সৌরবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, যোগবিদ্যা, ভূগোল, সংগীত, ভারতীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত এবং কিছু ক্ষেত্রে পালি। শিক্ষাদান ছিল নিঃশুল্ক। শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীরা নিজের সাধ্যমতো গুরুদক্ষিণা দিত। সম্পূর্ণ শিক্ষা পর্বটিই হতো ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা বিজ্ঞানের যে দুটি উপাদান— ABL (Activity Based Learning) ও PBL (Project Based Learning) আধুনিক কালে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যেতে পারে। আলাদা করে জ্যামিতির সূত্র না পড়িয়ে ছাত্রদের একটি নিখুঁত ত্রিস্তরীয় অষ্টকোণ যজ্ঞবেদি তৈরি করতে বলা হতো। ছাত্ররা গুরুর সাহায্যে অঙ্ক কষে তা তৈরি করতো। তারপর যজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্য জোগাড় করে তার সম্বন্ধে জ্ঞান লিপিবদ্ধ করতে বলা হতো। এই ভাবে তারা দ্রব্যগুণ শিখে যেত। সম্পূর্ণটাই গ্রুপ ওয়ার্ক ছিল এবং এবিএল, পিবিএল পদ্ধতির মাধ্যমে করা হতো। অস্ত্রবিদ্যা, বিশেষ করে ধর্নুবিদ্যা, গুরুকুলেই আরম্ভ হতো। উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা। প্রাচীন ভারতের বৃহদেশ্বর মন্দিরের ৯০ মিটার উঁচু চূড়োয় যারা ৬ টনের এক-একটি পাথর খণ্ড বসিয়েছিল, যারা ২৫০০ বছর আগে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহ এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ তলা গ্রন্থাগার তৈরি করেছিল, ২৫৮৯ মিটার উঁচু বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেছিল, সেই প্রযুক্তিবিদ ও স্থপতিরা এইসব বৈদিক গুরুকুলেই শিক্ষালাভ করেছিল এবং পরে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিল। গুরুকুলের সাফল্যই তাদের জন্য তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা, সারদাপীঠ বা নালন্দার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই সাফল্যের ফলস্বরূপ যে উন্নতি হয়েছিল, তার জন্যই আমাদের দেশের আর একটি নাম দেওয়া হয়েছিল— সোনার পাখি। সেই সোনার পাখিকে পুরোপুরি বশে আনা ও লুট করার জন্য ইংরেজদের প্রয়োজন হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। কিন্তু তা করতে গেলে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক জ্ঞান জোগাড় করে তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশদের ভারতবর্ষের শুধুমাত্র গুরুকুল প্রথার বিষয়েই তথ্য জোগাড় করে তাকে ধ্বংসের পরিকল্পনা তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। কেননা, তাদের পূর্বসুরি মুসলমান লুঠেরা ও দখলদারেরা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ততদিনে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাই মেকলে সাহেব ১৮২৩ সালে নিজের রিপোর্ট 'মিনিটস্ অন এডুকেশন' প্রকাশিত করার আগে দুটি সার্ভে কমিটি গঠন করল। জি.ডব্লু. লিনটারকে উত্তর ভারত ও থমাস মুনরোকে দক্ষিণ ভারতে সার্ভে করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। তারা নিজেদের প্রতিবেদনে জানালেন যে উত্তর ভারতে ৯৭ শতাংশ ও দক্ষিণ ভারতে ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা ছিল। তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা ভারতবর্ষে তখন প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রাম ছিল ও তার মধ্যে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার গ্রামে গুরুকুল ছিল। সেখানে ১৮টা বিষয় পড়ানো হতো। সমাজের লোকেরা মিলে সমবায় পদ্ধতিতে এই গুরুকুলগুলির পরিচালনা করত। তাদের রিপোর্টে এগুলিকে 'হায়ার লার্নিং ইনস্টিটিউশন' বলা হয়েছিল। সমসাময়িক ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে সাক্ষরতায়, বিষয় বৈচিত্র্যে ও স্কুলের সংখ্যায় ব্রিটেন তখন ভারতবর্ষের ধারে কাছে ছিল না। তৎকালীন ব্রিটেনের স্কুলগুলোয় তখন শুধু ধর্ম ও ব্যাকরণ পড়ানো হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এই রকমই একটি ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। তাদের দেশে এই পদ্ধতি শেক্সপিয়ারের পর আরও প্রায় ২৫০ বছর বিদ্যমান ছিল।

গুরুকুলের পর ছাত্ররা যেত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বের (১৩০০ খ্রি.পূ.) কালখণ্ডে ভারতবর্ষে ২৯টি এবং তিব্বত ও অনুরাধাপুরে (শ্রীলঙ্কা) একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হলো, উত্তর ভারতে— তক্ষশিলা, সারদাপীঠ (বর্তমান কাশ্মীর) ও পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার)। পশ্চিম ভারতে— বল্লভী ও উজ্জয়িনী, মধ্যভারতে বারাণসী, পূর্ব ভারতে

ফঃ ৬

মিথিলা, বিক্রমশিলা, নালন্দা, সোমাপুরা, জগদ্দল, বিক্রমপুর, রত্নগিরি, পুষ্পগিরি, নবদ্বীপ ও ওদন্তপুরি। দক্ষিণ ভারতে মল্কাপুরম, মান্যক্ষেত, নাগারজুন কোণ্ডা, কাঞ্চীপুরম, এন্নাইরম, কান্থালুরশালা, ত্রিশূর, সর্বজ্ঞাপুর অগ্রহার, কাদীয়ুর অগ্রহার, শৃংগেরী মঠ, উদুপি মঠ, সালৎগী ও বিজয়পুর। এর মধ্যে অনেকগুলিতেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থাও বিদ্যামান ছিল। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বনের মধ্যে প্রকৃতির কোলে ছিল, সেগুলিকে ফরেস্ট ইউনিভার্সিটি বলা হয়েছে। কিছু পাকা দালানও ছিল, যেমন, তক্ষশিলা, সারদাপীঠ, নালন্দা ইত্যাদি। এদের ব্রিক অ্যান্ড মোরটার ইউনিভার্সিটি বলা হয়েছে। কিছু মঠ ও মন্দিরে অবস্থিত ছিল। যেমন, শৃঙ্গেরী মঠ, কান্থালুরশালা, সর্বজ্ঞাপুর অগ্রহার ইত্যাদি। এইগুলিকে টেম্পল ইউনিভার্সিটি বলা হয়েছে। গুরুকুল ব্যবস্থাও এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অত প্রাচীনকালেও এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় বৈচিত্র্য ছিল চেখে পড়ার মতো। বিভিন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র, ফা হিয়েন ও হিউ এন সাংয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তক্ষশিলায় ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও ব্যবহারিক নানা বিষয় পড়ানো হতো। যেমন— কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, রাজধর্ম, চিকিৎসা, অর্থশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা ও অভিনয়। ভারতবর্ষ ও তার বাইরের ১২টি দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতেন। ধনী ছাত্র ও সমাজের নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান দিতেন। সেই অর্থে শিক্ষক ও অন্যান্যদের ভরণপোষণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচ চলতো। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জুডো, রেইকি, আকুপ্রেশার, ফেংশুই এমনকী পরমাণু বিদ্যা, মহকাশ বিদ্যা। তখন ভাষাতত্ত্বকে 'দশ ভাষা বিজ্ঞানম্' বলা হতো। এর মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের মূল্যবান পুঁথি হিউএন সাঙ নিয়ে যান এবং বাকিটা মুসলমান আক্রমণকারীরা ধ্বংস করে ফেলে। পরমাণু ও মহাকাশ বিদ্যার সেই ধারা বজায় থাকলে রাশিয়ার পরিবর্তে ভারতই প্রথম অন্তরীক্ষে মহাকাশচারী পাঠাতো এবং আমেরিকার পরিবর্তে আমরাই পরমাণু শক্তি ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা নিতাম।

খননকার্য ও বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া পুঁথি, দ্রব্য ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন কারণের জন্য বিখ্যাত ছিল। তক্ষশিলার খ্যাতি ছিল ধনুর্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য। এক সময় সর্বাধিক ১০৪টি প্রদেশের রাজকুমারেরা ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য তক্ষশিলায় ভর্তি হয়েছিলেন। এখানকার ছাত্র জীবক ছিলেন, প্রথম শল্যচিকিৎসক। তিনি চিকিৎসার প্রয়োজনে একজন ব্যবসায়ীকে খাটের সঙ্গে বেঁধে, তার মাথার চামড়া কেটে সেখানকার মাংস সরিয়ে তার মস্তিষ্ক থেকে দুটি কৃমি বের করেছিলেন। তারপর চামড়া সেলাই করে ব্যথা উপশমের মলম লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঘ্রাণ-চিকিৎসার জনক ছিলেন। হিউএন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জীবক পদ্মফুলের ওপর কয়েকটি ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে গৌতম বুদ্ধকে তার ঘ্রাণ নিতে বলেন। এইভাবে তিনি তার পিত্তরসের গোলমালের অসুখ সারিয়ে দেন। এই ভাবেই পুঁটলির মধ্যে ভেষজ ভরে ঘ্রাণের মাধ্যমে তিনি এক ধনি বণিকের স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে ছিলেন। সেই বণিক আচার্য জীবককে প্রচুর অর্থ ছাড়াও একটি রথ, একটি দাস ও একটি দাসী দিয়েছিলেন। জীবক সেই সবই রাজা বিম্বিসারকে দিয়ে দিয়েছেন। রাজার জন্যই তো প্রজারা শিক্ষার সুযোগ পায়। সত্যিই, তখনকার চিকিৎসকরা মানবসেবার জন্য চিকিৎসা করতেন, নিজে ধনী হওয়ার জন্য নয়। গর্ব করার মতোই ছিল আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি।

উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল গণিত ও মহাকাশবিদ্যার জন্য। তাদের নিজস্ব ও বিখ্যাত একটি অবজারভাটরি ছিল, যেটি তখনকার 0° অক্ষাংশে অবস্থিত ছিল। ইংরেজরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস না করলে আজকে জিএমটি-র পরিবর্তে আইএসটি (ইন্ডিয়ান স্ট্যার্ন্ডাড টাইম গোটা পৃথিবীতে লাগু থাকত। সেখানকার ছাত্র ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহিরের ধারায় কাজ করে ত্রিকোণ ভাগ, দ্বিঘাত সমীকরণ, চক্রাকার চতুর্ভুজ অঞ্চল গাণিতিক অগ্রগতিকে আরও উন্নত করেছিলেন। তিনি প্রথম শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন। এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় ভাস্কর বা ভাস্করাচার্য। তিনি ইউরোপের বহু আগে ভারতেই অঙ্কশাস্ত্রকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে আজও তাঁকে 'founder of differential calculus' বলা হয়।

কাশ্মীরের সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল,; বহু প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষণ করে তার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার জন্য, বিশেষ করে ব্যাকরণ ও দর্শন। বিশিষ্ট দ্বৈত দর্শন বিদ্যাপীঠের বিখ্যাত আচার্য রামানুজ সুদূর তামিলনাড়ু থেকে কাশ্মীরের সারদাপীঠে এসেছিলেন 'বোধায়ন বৃত্তি'র প্রাচীন ও একমাত্র পাণ্ডুলিপির অধ্যয়ন করতে। এর ভিত্তিতেই তিনি 'ব্রহ্মসূত্র'র প্রাথমিক ভাষ্য ও পরে শ্রীভাষ্য রচনা করেছিলেন। শারদাপীঠ তর্কবিতর্কের জন্যও বিখ্যাত ছিল। আদি শংকরাচার্য এখানেই পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রকে তর্কে পরাজিত করে 'জগদ্‌গুরু' উপাধি লাভ করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের 'কান্থালুর শালা' একটি মন্দির বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এর বিশাল সাজানো প্রাঙ্গণ ও শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য একে 'দক্ষিণের নালন্দা' বলা হতো। এক অবস্থিতি ছিল বর্তমান তিরুবন্তপুরম অঞ্চলে। দক্ষিণ

ভারতেরই এন্নিয়ারম বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল বেদশাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য। এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এই শিক্ষায়তনের সঙ্গেই একটি হাসপাতালও ছিল। সেখানে ১৫টি শয্যা, একজন চিকিৎসক, একজন শল্য চিকিৎসক, দুজন পুরুষ কর্মী ও দুজন ধাত্রী ছিলেন। ইউরোপিয়ানদের বহু আগেই আমাদের দেশে ফিমেল নার্সের প্রচলন ছিল। এর ওষুধ বিভাগে অন্যান্য ওষুধ ছাড়াও পাওয়া যেত হরিতকি, বিল্বদিঘৃত, বজ্র-কল্প, কল্যাণ লবণ ইত্যাদি।

অনেক মাতা-পিতাই, নালন্দা বা বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও নিজের সন্তানকে গুজরাট অঞ্চলের বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতেন। কেননা বল্লভীর স্নাতকরা সহজেই সরকারি চাকরি পেয়ে যেত। কারণ তাদের নীতি (পলিটিক্যাল সায়েন্স) ও বাণিজ্যের জ্ঞান খুব প্রখর হতো।

প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য কঠিন পরীক্ষা দিতে হতো। সেই মর্মে ছাত্রদের তৈরি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আশপাশে কিছু গুরুকুল থাকত যারা শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের তৈরি করত। অনেকটা আজকের আইআইটি বা জেইই পরীক্ষার কোচিং সেন্টারের মতো। বিদ্যাসাগর যেরকম মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটের স্থাপনা করেছিলেন ও সংস্কৃত কলেজের প্রধানচার্যও ছিলেন, ঠিক সেইভাবেই আচার্য গুণমতি ও স্থিরমতি বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা করেছিলেন এবং পরে নালন্দার আচার্য হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তর্কবিতর্ক ও ক্রিয়াকলাপ ছিল শিক্ষাদানের মূল উপাদান। একটা সময় পর্যন্ত লিখিত বিবরণ বা পাঠ্যপুস্তক না থাকায়, ক্রিয়াকলাপ ছিল শিক্ষাদানের মাধ্যম। শিক্ষণবিজ্ঞান অনুযায়ী ছাত্রদের তর্ক করা শিখতে হতো একটি পদ্ধতি মেনে। বিষয়টিকে বাদবিদ্যা বলা হতো। এটি শেখার ও প্রস্তুত করার ৯টি ধাপ ছিল, যথা— (১) সাধ্য, (২) সিদ্ধান্ত, (৩) হেতু, (৪) উদাহরণ, (৫) সাধর্ম্য, (৬) বৈধর্ম্য, (৭) প্রত্যক্ষ, (৮) অনুমান ও (৯) প্রমাণ। বিচারকদেরও প্রতিজ্ঞন্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সম-যাস্য ইত্যাদির মতো ২২টি মাপকাঠি মেনে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করতে হতো। প্লেটোর 'ডিবেটিং সোসাইটি'র খুব নাম ছিল। কিন্তু তাতে এইসব উপাদান ছিল না। ভারতবর্ষ প্লেটোরও বহু আগে থেকে এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এগিয়ে ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম খুব উন্নত ছিল। এই বিষয়টিকে আয়ুর্বেদ বলা হতো। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের আলাদা উপনয়ন হতো এবং বিদ্যাশেষে সমাবর্তন হতো। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রদের অনেকগুলি শপথ নিতে হতো। যার মধ্যে মুখ্য ছিল 'দরিদ্র রুগির বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করা'। দেশের রাজা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান হতেন। তিনি এই অনুষ্ঠানে সবার সম্মুখে অনুমতি দিলে তবে ছাত্র নিজেকে বৈদ্য বলে পরিচয় দিতে পারত। এই শংসাপত্রটিই ছিল 'বৈদ্যের'। সফল চিকিৎসক তৈরি হতে একটি ছাত্রের আট বছর সময় লাগত। চরক সংহিতায় এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রত্যেক ছাত্রকেই সাধারণ চিকিৎসা শাস্ত্র পড়তে হতো। এটি আজকের এমবিবিএস-এর সমতুল্য উপাধি ছিল। এরপর সে চিকিৎসার আটটি শাখার যে কোনো একটিতে বিশেষজ্ঞ তৈরি হতে পারত (আজকের এমএস, এমডি, ডিজিও, ইএনটি ইত্যাদি)। সেই আটটি শাখা হলো— (১) অভ্যন্তরীণ ওষুধ (Internal Medicne), (২) শল্য চিকিৎসা (surgery), (৩) চোখ, নাক, কান (ইএনটি), (৪) স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ (gynecologist), (৫) ধাত্রী ও শিশুরোগ (obstetric & pediatrics), (৬) মনোবিজ্ঞান (psychology), (৭) টক্সিকোলজি (toxicology), (৮) পুনর্জীবন ও জীবাণুনাশ (rejuvenation & verilisation)।

দেড় থেকে দু' হাজার বছর আগে যে দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এত উন্নত পাঠ্যক্রম ছিল, সেই দেশই যে পৃথিবীর পথপ্রদর্শক ছিল এবং সেই দশকে যে 'সোনার পাখি' বলা হতো সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আজ আমাদের সেই শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে অপ্রাসঙ্গিক একটি ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কীভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হলো ও তাকে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে আমাদের সকলকে এই বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। তা করতে পারলে আমরা আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। ভারত ও ভারতীয়ত্ব বিশ্ব দরবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করবে। ভারতের পক্ষেই সম্ভব হবে বৈদিক মতে সম্পূর্ণ বিশ্বকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় গিয়ে বেদান্ত প্রচারের জন্য যে ভারতবর্ষকে তুলে ধরেছিলেন, আসুন আমরা সবাই মিলে সেই বৈদিক ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প গ্রহণ করি।

কৃতজ্ঞতর স্বীকার :

১। বক্তৃতা—প্রফেসর সাহানা সিংহ।

২। গ্রন্থ—'অমৃত পান্থ'।

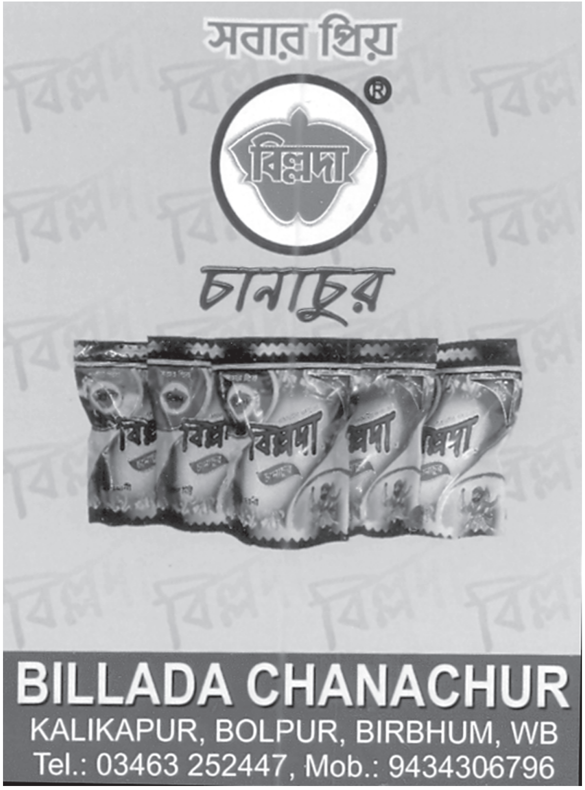

পাদরি স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ফাদার স্ট্যান স্বামী গত ৫ জুলাই ২০২১, মুম্বাইয়ের খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে মারা যান। এই মৃত্যুকে নিয়ে মুসলমান, খ্রিস্টান, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, লিবারেল, সেকুলার দুষ্টচক্র চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপাতে। তবে জেলখানায় তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যাননি। যদি তাই হতো তা হলে যে কী হতো ভগবান জানেন। ৮৪ বছরের এই জেসুইট পাদরি অলঝাইমার্স ও হৃদরোগের রোগী ছিলেন। সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কাজেই বয়স, কো-মর্বিডিটি এইসবের কারণে তাঁর মৃত্যু।

স্বামী ২৬ এপ্রিল ১৯৩৭ তামিলনাড়ুর ত্রিচিতে জন্মেছিলেন, ৭০-এর দশকে তিনি ফিলিপাইনসে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৯৭৫-১৯৮৬ পর্যন্ত তিনি জেসুইট পরিচালিত ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান সোশ্যাল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ছিলেন। তিনি সংবিধানের পঞ্চম সিডিউল প্রয়োগ করে শুধুমাত্র বনবাসীদের নিয়ে তৈরি ট্রাইবস অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল গঠন কেন করা হচ্ছে না সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে দেশ স্বাধীন হয়েছে ৭৪ বছর এবং তার বেশিরভাগ সময়ে কংগ্রেসের শাসনে ছিল তখন কেন এই প্রশ্ন তোলা হয়নি? আর শুধুমাত্র বনবাসী নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা কেন? কারণ তাদের সহজে হাত করা যায়। ভারতে কিন্তু অ-বনবাসী বহু মানুষ বহুকাল ধরে দারিদ্র্য ও নানাবিধ কষ্টে আছেন। তার ঐতিহাসিক কারণ আছে এবং সরকার বিপুল জনসংখ্যার চাপ সহ্য করেও তাঁদের কষ্ট লাঘবের প্রয়াস চালাচ্ছে। এই খ্রিস্টান পুরোহিত গোছের মানুষের এত চিন্তা কেন বনবাসীদের নিয়ে! কারণ তাদের বোঝানো হয় যে হিন্দুরা বহিরাগত এবং বনবাসীরাই এদেশের মূল অধিবাসী, বাইরের আর্যরা এসে তাদের জঙ্গলে ঠেলে দিয়ে চরম দুর্দশার মুখে ফেলে রেখেছে। এইভাবে তাদের মগজ ধোলাই করার কাজটা বিগত দুশো আড়াইশো বছর ধরে চলছে। সেই কারণেই আজ বনবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের এত রমরমা।

স্ট্যান স্বামী খুবই আলোচিত ব্যক্তি। মোদীবিরোধী যত শক্তি আছে তাদের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ, কাল্ট ফিগার। সুপরিচিত হিন্দু বিদ্বেষী কয়েকটি পত্রিকার প্রথম পাতায় কয়েক কলম জুড়ে এই মৃত্যুর খবর পরদিন বেরোয়। সেখানে তাঁর প্রধান পরিচয় 'আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি পুরোধা পুরুষ' (?)। কিন্তু তিনি যে জেসুইট পাদরি ছিলেন, মাওবাদী সহিংস রাজনীতির সঙ্গে যে তাঁর গভীর যোগ ছিল, মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোরেগাঁওয়ের হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে যে তিনি যুক্ত ছিলেন— এসব খবর খুব ছোটো করে ছাপা হয়েছে।

যে খবরটা আদৌ উল্লেখ করা হয়নি সেটা হলো ঝাড়খণ্ডের প্রায় ৩২ শতাংশ বনবাসী জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশকে তিনি কীভাবে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন অর্থ চাকরি ও শিক্ষার টোপ দিয়ে। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে প্রথম মামলা হয় এই ধর্মান্তরণ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অভিযোগের ভিত্তিতে। প্রমাণ এতটাই পোক্ত ছিল যে, স্বামী অস্বীকার করতে পারেননি অভিযোগ। মাওবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিযোগ যে সত্য, তার প্রমাণ পুলিশের দাখিল করা চার্জশিটের ছত্রে ছত্রে পাওয়া গেছে। এই অভিযোগও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, যদিও এইসব কাজকে বলেছেন, বনবাসীদের অধিকার রক্ষার লড়াই।

পালঘরের দুই সাধুকে পিটিয়ে মারার ঘটনার কী হলো, সে সম্পর্কে কিছু জানেন কি? কোনও খবরের কাগজে তার কোনো উল্লেখ দেখেছেন কি? দেখবেন না। কারণ সাধুখুন নিয়ে প্রগতিপন্থী ও সেকুলাররা সবসময় নীরব থাকেন। কিন্তু স্ট্যান স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তারা। ধর্মের বিরোধিতা যারা করেন, তারা বিশেষ কোনো কোনো ধর্মের যে কত অনুরাগী, তা এসব ব্যাপারে বোঝা যায়।

মনে রাখতে হবে হিন্দু কোনো রিলিজিয়ন নয়। মনে রাখতে হবে যে ফিলিপাইনস এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ ছিল, তাকে এইরকম ব্যক্তিরাই আক্ষরিকভাবে 'ছলে-বলে-কৌশলে' খ্রিস্টান- সংখ্যাগুরু করে এবং দেশটিকে খ্রিস্টান দেশ বানায়। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় এইরকম খ্রিস্টান দেশ ছিল না।

কেউ হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয় না, যে কোনো ভারতীয়ই হিন্দু হয় স্বাভাবিকভাবেই। বনবাসী ভারতীয়রা স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু; তাদের জোর করে এই জেসুইটরা খ্রিস্টান বানায়। (মুসলমানরাও এই ব্যাপারে পাল্লা দিচ্ছে)। তাই ভারতে জেসুইটদের কার্যকলাপের ইতিহাস ঘৃণা জাগায়। বিশেষত, কেরলে। সেই চরিত্রেই একজন, 'স্ট্যান' যিনি 'স্বামী নামের আড়ালে তার সেমিটিক নখ-দাঁত আড়াল করে রেখে আমাদের সরল বনবাসী ভাই-বোনদের ধর্ম-সংস্কৃতির আমৃত্যু সর্বনাশ করে গেছে, বৃদ্ধ হলেও, সেই আততায়ীর মৃত্যুতে আশ্বস্ত হই।

মনে হয়, যাক একজন হলেও আততায়ী কমল।

দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগ ছিল প্রবল। সেই সঙ্গে প্রচুর বনবাসীকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। ঝাড়খণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ না থাকলে আরও কত সহজ সরল বনবাসীকে যে তিনি খ্রিস্টান করতেন, তার ইয়ত্তা নেই। এরকম একজন মানুষের মৃত্যু অন্তত দেশের পক্ষে মঙ্গলের।

তাঁর আইনজীবী জানান যে ৩ জুলাই, শনিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় স্বামীর। তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। একথা শুনে দুঃখপ্রকাশ করেন বিচারপতি। তারপরেই স্ট্যান স্বামীর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক আখ্যা দিয়ে এই মৃত্যুর বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি দানান তিনি।

উল্লেখ্য, ভীমা-কোরেগাঁও দাঙ্গায় শহুরে নকশালদের বিরাট ভূমিকা ছিল। এদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার চক্রান্ত করা হয়েছিল। ফলে এই গুরুতর ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। তারপরেই পুরো চক্রান্তের পর্দাফাঁস হয়। গ্রেপ্তার করা হয় একের পর এক শহুরে নকশালকে।

এর আগেও একাধিকবার নিজের শরীরস্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সব জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় এনআইএ কোর্ট। ফলে শেষমেশ জেলেই মত্যু হলো মাওবাদী নেতা খ্রিস্টান মিশনারি স্ট্যান স্বামীর।

২০১৮ সালের ভীমা-কোরেগাঁওয়ের হিংসায় তাঁকে আটক করা হয়। তিনি দাবি করেছিলেন পুণেতে ছিলেন না ওই সময়ে। তাঁকে মাওবাদীদের প্রতি দুর্বলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি ও আরেক অভিযুক্ত সুধা ভরদ্বাজ মিলে নির্যাতিত বন্দি সংহতি সমিতি স্থাপন করেন। তাঁরা ৩০০০ মাওবাদী বলে অভিযুক্ত পুরুষ ও নারী বন্দির মুক্তির জন্য লড়াই করতে এই সমিতি গঠন করেছিলেন। এই সংগঠন আসলে মাওবাদীদের জন্য অর্থসংগ্রহ করত। ২০২০ সালে ৮ অক্টোবর এনআইএ তাঁকে জেসুইট সোশ্যাল অ্যাকশন কেন্দ্র থেকে গ্রেপ্তার করে, আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্টের অধীনে। সেই আইনে জামিন অগ্রাহ্য করা যায়। কেসটা প্রথমে পুনে পুলিশ করছিল পরে তা এনআইএর অধীনে আনা হয়।

তার আগে ২০১৮-র জুনে একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ভার্নন গনজালভেজ ও অরুণ ফেরেরাকেও, একই জেলে রাখা হয়েছিল। সব খ্রিস্টান চার্চ এর প্রতিবাদ তো করবেই সব ফাঁস হয়ে যাবে তো। এদের নাম— All India Catholic Union, the Catholic bishops Conference of India, Kerala Catholic Bishops' Conference (KCBC), Kerala Latin Catholic Association (KLCA), Kerala Jesuit Provincial, Federation of Asian Bishops Conference (FABC), and the international Jesuit community। আর যারা অভিযোগ করেছিল তারা হলো— শশী থারুর, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা প্রভৃতি সুপরিচিত মোদীবিরোধীরা। উল্লেখযোগ্য হলো অর্থনীতিবিদ জাঁ দ্রেজও ছিলেন এই দলে। স্ট্যান বারবার বেল আবেদন করেছিলেন অসুস্থতার কারণে; সরকার থেকে তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করতে চাইলেও তিনি অদ্ভুতভাবে তা না করে তাঁর কর্মক্ষেত্র রাঁচী যেতে চান। ২৮ মে বম্বে হাইকোর্ট তাঁকে কোনো প্রাইভেট হাসপাতালে ভরতি করার নির্দেশ দিলে তিনি মুম্বাইয়ের হোলি ফ্যামিলি হসপিটালে ভরতি হন। তার কোভিড-১৯ ধরা পড়ে। ৪ জুলাই তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়। বম্বে হাইকোর্টে জামিন মামলার শুনানি হওয়ার আগেই ৫ জুলাই কোভিড সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮১৮ সালের কোরেগাঁও যুদ্ধে তথাকথিত দলিতদের জন্য গুরুত্ব দেয় স্বার্থান্বেষী মহল। ওই বছর ১ জানুয়ারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বম্বে প্রেসিডেন্সি প্রচুর সংখ্যায় মাহারদের নিয়ে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের আরও শক্তিশালী বাহিনীকে পরাস্ত করে। ব্রিটিশরা বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করে। ১৯২৮ সালে বি আর আম্বেদকর এখানে প্রথম স্মরণ সভা করেলেন। তখন থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি আম্বেদকর অনুগামীরা সেখানে জড়ো হয়ে তথাকথিত উচ্চবর্ণের পেশোয়াদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় উৎসব পালন করে।

ঔরঙ্গজেব ১৬৮৯ সালে শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজী মহারাজকে টুকরো টুকরো করে কেটেছিল। ভীমা কোরেগাঁওয়ের কাছে বাধু বুদ্রুক গ্রামের গোবিন্দ মাহার সেই শরীরের টুকরোগুলোকে সংগ্রহ করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিল। ওই গ্রামের মাহাররা দাবি করে যে সাম্ভাজী মহারাজের স্মৃতিস্তম্ভ তাঁরাই নির্মাণ করেন, তারপরেই গোবিন্দ মাহারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন মাহাররা। কিন্তু মারাঠারা সাম্ভাজী মহারাজের শেষকৃত্যে গোবিন্দ ও অন্য মাহারদের ভূমিকা স্বীকার করে না বলে একটি গোষ্ঠী দাবি করে। এই ব্যাপারে মাহারদের খেপিয়ে তোলার কাজ কোনো গোষ্ঠী করছিল বলে ভারত সরকারের কাছে খবর ছিল। ২০১৮ সালে স্মরণানুষ্ঠানের পূর্বে ২৫০ জন বহুজন অর্থাৎ তথাকথিত নীচু জাতের মানুষজন এলগার পরিষদের ব্যানারে পুণেতে জমায়েত করে। সেটা হচ্ছে পেশোয়াদের পূর্বতন রাজধানী। তার মধ্যে অবসৃত দুজন বিচারপতি ছিল এবং জিগনেস মেওয়ানিও ছিল। ১ জানুয়ারি ২০১৮-তে লক্ষ লক্ষ তথাকথিত দলিত ভীমা কোরেগাঁওতে ঢোকে। উত্তেজনা চড়তে থাকে কে শেষকৃত্য করেছিল এই নিয়ে। ভীমা কোরেগাঁওয়ের পঞ্চায়েত ওই দিন অনুষ্ঠান বাতিলের ডাক দেয়, সব দোকান বন্ধ রাখে। ১৬ বছরের এক বালক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ৩ জানুয়ারি প্রকাশ আম্বেদকর মহারাষ্ট্র বনধ ডাকেন। এর ফলে ৩০ জন পুলিশ আহত হয় ও ৩০০ জন গ্রেপ্তার হয়। ২ জানুয়ারি সাম্ভাজী ভিদে ও মিলিন্দ একবোতের নেতৃত্বে দলিতদের সারা প্রদেশ জুড়ে প্রতিবাদ হয়। ২০১৮ সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত মিলিন্দ একবোতে, রোনা ইউলসন ভারাভারা রাও, অরুণ ফেরেরা, সুধা ভরদ্বাজ ও গৌতম নওলাখাকে ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মাওবাদী যোগ ছিল ও ভীমা-কোরেগাঁও হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল।

এনআইএ ২০২০ সালের অক্টোবরে ১০০০০ পাতার চার্জশিট জমা দেয়, তাতে আরও নতুন নাম আসে যেমন স্ট্যান স্বামী। অভিযোগ ছিল যে তিনি দলিত ও মুসলমানদের একত্রিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। সেই প্রচেষ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রও ছিল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, হিন্দুদের একটা বৃহৎ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে ও তাদের ধর্মান্তরিত করে হিন্দুকে দুর্বল করে ভারতে খ্রিস্টান-মুসলমান দেশ গড়া যেটা ওরা সুদানে করেছে, ফিলিপাইনসে করেছে, বলতে গেলে পুরো আফ্রিকা মহাদেশকেই করেছে। তিনি তামিলনাড়ু ছেড়ে ঝাড়খণ্ডে পড়ে থাকার মতো বড়ো মাপের মানুষ নন। তাঁর সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী সিপিআই (মাওবাদী)-রও যোগ আছে। সুতরাং... সব ঠিকই আছে। ▯

রামানুজ গোস্বামী

শাসক দলের অত্যাচারে বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গ

এই নিবন্ধটির আর কোনও ভূমিকারই প্রয়োজন নেই। ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই বিষয়ে বহুদিন যাবৎ বিজেপির সাধারণ সদস্য থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব— সকলেই বারে বারে অভিযোগ করেছেন। নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে (এমনকী নির্বাচন চলাকালীনও) হাজার হাজার বিজেপি কর্মী নিহত, আহত বা ঘরছাড়া হয়েছেন বা বলা ভালো যে, তৃণমূলের অত্যাচারেই এই সব ঘটনা ঘটেছে। কথাটা এই যে, রাজ্যে আইনের শাসন বলে আর কিছুই নেই। তৃণমূল করলে যে কোনও বেআইনি কাজ করা যায়। এই রাজ্যে বিজেপি করবার অপরাধে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় কোথাও মুচলেকা দিতে হয় প্রকাশ্যে, আবার কোথাও বা মস্তকমুণ্ডনও করতে হতে পারে।

রাজনৈতিক সন্ত্রাসে এই রাজ্য ভারতের যে কোনও রাজ্যের থেকে বহু যোজন এগিয়ে। মানুষের প্রাপ্য ন্যূনতম অধিকারটুকুও এখানে পাওয়া যায় না। যেটুকু মেলে তা হলো ভিক্ষা আর তা পেতে হলেও হতে হবে তৃণমূলের সদস্য বা সমর্থক। অন্যথায় তা না মেলাও অস্বাভাবিক নয়। এই যে সন্ত্রাস, এতে পুরোপুরি ভাবেই সমর্থন রয়েছে তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরের। প্রশাসন ও পার্টি আজকের পশ্চিমবঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। তাই বহু ঘটনাকেই 'সাজানো' বা 'ছোট্ট' ঘটনা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। মূলধারার (mainstream) সংবাদ-মাধ্যগুলিও আজ এই রাজ্যের সরকারের জয়গানেই ব্যস্ত। কারণটা হলো— বিজ্ঞাপন। এই রাজ্যে পুলিশ ও পার্টির ক্যাডারে আজ আর কোনও পার্থক্যই নেই। তাই বহুক্ষেত্রেই বিজেপির অভিযোগে এফআইআর-টুকু পর্যন্ত করা হয় না। এক্ষেত্রেও বলা ভালো যে, তা নেওয়া হয় না।

তাছাড়া অভিযোগ যদি কোনও ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হয়, (সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় হলে তো আর কথাই নেই) তবে তো পুলিশ সেকথা শুনবেই না। এই রাজ্যে এইরকম ঘটনার অজস্র উদাহরণ আছে। সিএএ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে যেহেতু এই রাজ্যের সরকারের প্রশ্রয় ছিল, তাই স্পষ্টতই অপরাধীদের বিরুদ্ধে তেমন একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। সম্প্রতি ভোট-পরবর্তী ক্ষেত্রে এই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী ঘরছাড়া, বহু কর্মীর বাড়ি, দোকান ইত্যাদি লুঠ করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে হিন্দুদের নির্যাতন করে চলেছে। যদিও রাজ্য-সরকার বারে বারে এটাই বলে এসেছে যে, এসব মিথ্যা অভিযোগ ও এইসবের তাই কোনও গুরুত্বই নেই।

এই রাজ্যে নাকি একেবারে দারুণ শান্তি বিরাজ করছে। হাইকোর্টে এইসব নিয়ে বারে বারে মামলা হয়। যদিও রাজ্য সরকার এসবে কোনও ব্যবস্থাও নেয় না বা ভ্রূক্ষেপও করে না কিন্তু এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা ভেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করবার নির্দেশ দেয়। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট পেশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এই রিপোর্ট তৈরি করবার ক্ষেত্রেও কমিশনের সদস্যদের নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। বহু ক্ষেত্রে তো তাদের উপদ্রুত এলাকায় যাওয়া বা সন্ত্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেই বাধা দেওয়া হয়েছে। যাইহোক, এই রাজ্যে যে আইনের শাসন নেই, বরং শাসকের নিজস্ব আইন বা অত্যাচার চলে, এই রিপোর্টে তা একেবারেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। খুবই স্পষ্ট ভাষায় এবং যথোচিত ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসা ও এর কারণগুলির প্রসঙ্গে বাস্তব চিত্রটাই উঠে এসেছে এই রিপোর্টে।

দৈনিক বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দ্বারা রাজ্য-সরকার যে সকল সংবাদমাধ্যমকে নিজেদের মুখপাত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের অবশ্য এই রিপোর্টে নিতান্তই মুশকিল হয়েছে। কারণ, যে সহজ-সরল সত্যটাকে এরা এতদিন ধরে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে— তা আজ সর্বসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। এই রিপোর্টের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, 'The

situation in the State of West Bengal is a manifestation of 'Law of Ruler,' instead of 'Rule of law'।' সুতরাং, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই রাজ্য অতীতের একটি জমিদারী বা ভারতবিরোধী পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়েছে বা হওয়ার পথে চলেছে। তাই এখানে সেই অতীতের মতো জমিদারী শাসনই চলে। এখানে তৃণমূল নেতাদের কথা মতো না চললে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে একঘরে করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়, বাড়ি-ঘর, দোকান, সম্পত্তি সবই লুঠ করা হয়, কাজ পাওয়া যায় না, ১০০ দিনের কাজের সুযোগ পাওয়া যায় না, ব্যবসা করতে দেওয়া হয় না এবং যথেচ্ছভাবে অত্যাচারিতও হতে হয়। এই যে অত্যাচার অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতিগ্রস্থ পুলিশ কর্মচারি ও সিভিক ভল্যান্টিয়ারদের দ্বারাও হয়ে চলে আর এটা যে কলকাতা বা শহরাঞ্চলে ঘটে না--- এমনটা ভাবার কোনও কারণই নেই। বিজেপি কর্মীদের মারধর, খুন করা, ধর্ষণ, নির্যাতন, সম্পত্তি লুণ্ঠন, এমনকী বিজেপি এবার অপরাধে ভ্যাকসিন না পাওয়ার মতো ঘটনা এই রাজ্যে প্রতিনিয়তই ঘটে চলে। এটাই বাস্তব চিত্র।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে এটা উঠে এসেছে যে, এই কমিশন বারে বারে রাজ্যের শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং অভিযোগের খতিয়ান গ্রহণ করেছেন। এই রিপোর্টেই স্পষ্ট হয়েছে যে, রাজ্য সরকার এই সকল নির্যাতিত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো তো দূরে থাকুক, ন্যূনতম আশ্বাসটুকুও দেয়নি। বস্তুত অত্যাচারী জমিদারদের শাসনের চিত্র তো আমরা ইতিহাস তথা সাহিত্যে পেয়েই থাকি আর আজ পশ্চিমবঙ্গে আবারও এই একুশ শতকে সেই একই নিষ্ঠুরতা দেখা গেল।

এই রিপোর্টে 'notorious criminal' প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা হয়েছে। বাস্তব তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে এবং এই সকল 'notorious criminal'-দের নামও তালিকায় রয়েছে। এতে প্রাক্তন বিধায়ক (অবশ্যই তৃণমূলের) থেকে শুরু করে বর্তমান বিধায়ক, এমনকী মন্ত্রীরও নাম রয়েছে বলে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমেই দেখানো হয়েছে। স্বভাবতই রাজ্যের তৃণমূলী মিডিয়াগুলি এতে যারপরনাই অস্বস্তিতে পড়েছেন, সারা দেশ তথা বিশ্ব আজ পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব চিত্রটা বুঝতে পেরেছে। তৃণমূল দল তথা রাজ্য সরকার সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ কারণ, এতে নাকি সরকারকে কালিমালিপ্ত করবার চক্রান্ত করা হয়েছে। বস্তুত, যে কোনও ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করা তথা দেশের আইন-কানুনেরও তোয়াক্কা না করা, যা ইচ্ছা তাই করা, প্রকাশ্যে দুর্নীতি করা, বিচারপতিদেরকেও কটূক্তি করা ইত্যাদিতে তো এই রাজ্য সরকার একেবারেই সেরা। এর উপরে আবার যুক্ত হয়েছে জালিয়াতি-বিদ্যা। জাল ভ্যাকসিন, ভুয়ো অফিসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে তো এই রাজ্য একেবারেই অদ্বিতীয়। এর সঙ্গে আবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রীর প্রচার। অবশ্য স্বপ্ন তো যে কেউ দেখতেই পারে, তা সে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে হলেও। কাজেই এতে কিছুই আসে যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ে কথা বলা দরকার, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি কার্যকলাপ মাত্রাতিরিক্ত ও লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে। খাস কলকাতা আজ জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এটা তো হওয়ারই ছিল কারণ, যখন সরকারের অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে থেকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীর দ্বারা বিশেষ অঞ্চলকে 'মিনি পাকিস্তান' বলে উদ্ধৃত করা হয়, যখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী তোষণ প্রসঙ্গে 'দুধেল-গাই' তত্ত্বের অবতারণা করেন— তখন এই ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। ফলস্বরূপ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টেও এটা জানা গিয়েছে যে, এই রাজ্যের 'notorious criminal'-দের মধ্যে শতকরা ৮০ শতাংশেরও বেশি হলো মুসলমান। যে রাজ্যে এই ভাবে নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ করা হয়, যে রাজ্য অনুপ্রবেশের তালিকায় সেরা, যে রাজ্যে সিএএ বিরোধিতা করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করলেও কিছুই শাস্তি হয় না— সেই রাজ্যে তো এমনটাই ঘটবে।

সঙ্গত কারণেই এনএইচআরসি তাই সিবিআই তদন্তের কথা বলেছেন। এছাড়াও প্রয়োজন কঠোর ভাবে আইন-প্রণয়ন করে এই রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করা যাতে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা পায়। সারা ভারতের লজ্জা আজ এই পশ্চিমবঙ্গ। যেখানে সভ্যসমাজের রাজত্ব নয়, বরং চলে 'জঙ্গলরাজ্য'। অবিলম্বে এর সমাধান দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের রাজ্যেই মানুষের মন আজ ভয়ে ভীত, সংকুচিত, সন্ত্রস্ত। এই ভয় শাসকের। শাসক তৃণমূল আজ সরকারি যন্ত্র ও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে। অবিলম্বে একে থামাতে না পারলে সারা ভারতই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অবস্থা হয়ে উঠবে ভয়াবহ। তাই, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীর রক্ষার্থে আজ বিচার হওয়া দরকার এই সন্ত্রাস ও এই সন্ত্রাস ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্তদের। ভারত সরকারেরও এই ব্যাপারে যথেষ্টই দয়িত্ব আছে। সেকথাও মনে রাখা প্রয়োজন। তবেই গড়ে উঠবে সুরক্ষিত ভারত।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE
8/1/B, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700 027, India
www.paharpur.com
CIN : U02005WB1949PLC018363
Ph. +91-33-4013 3000
Dir. +91-33-4013 3403
Fax : +91-33-4013 3499
vswarup@paharpur.com